Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত বিপ্লবী সূত্রগুলোকে অর্থহীন জপমন্ত্রের মত মুখস্থ করে আউড়ে চলা এবং প্রতিপদে বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নামে অতি বামপন্থার দিকে গিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার যে প্রবণতা তারই নাম ডগ্‌মাটিজম-সেক্‌টারিয়ানিজম।

—ত্রিদিব চৌধুরী

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়	১
সাম্প্রদায়িক .... এগোতে হবে	১
দেশে-বিদেশে	২
রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ....রাজনৈতিক চাল	৩
পি এস ইউ'র রাজ্য কাউন্সিল.....	৪
নাগিনীরা..... বিষাক্ত নিঃশ্বাস	৫
অগ্নিপথ : একটি সামাজিক ব্যাধি	৬
বালিখাদান—হাতে রইল পেনসিল	৭
নূপুর শর্মার বিধ্বংসী মন্তব্য	৮

70th Year 16th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 11th June & 18th June 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

বিজেপির 'বুলডোজার রাজনীতির' আগ্রাসন

অবলীলায় নূপুর শর্মা প্রচন্ড অনৈতিক ও সংবিধানবিরোধী কাজ করে দেশব্যাপী অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়েও রেহাই পেয়ে যান। রেহাই পেয়ে যান দিল্লির বিজেপি নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত দাঙ্গাবাজ হিন্দুত্ববাদী উগ্র বাহিনীর লোকজন। অথচ গত দিল্লি দাঙ্গার মূল চক্রীদের আড়াল করার পর নতুন এক আগ্রাসী পথ বেছে নিয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল। তা হল অবৈধ নির্মাণ ধ্বংসের বাহানায় বুলডোজার রাজনীতি। কাউকে পছন্দ না হলে বা কেউ সরকারের নীতির সমালোচনা করলে, বিশেষ করে সে যদি সংখ্যালঘু হয়, পৌরসভা বা কোনো উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে তার ঘরবাড়ি দোকানের অবস্থিতি বা তার প্ল্যান অথবা এক্সটেনশনকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করে আচমকাই বুলডোজার চালিয়ে তার জীবনজীবিকা ধ্বংস করো।

জাহাঙ্গীরপুরীর বুলডোজার আগ্রাসনের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে বামপন্থীদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সহ সাধারণ নাগরিকদের অনেকেই পথে নেমেছেন। শীর্ষ আদালতের কাছে এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক প্রক্রিয়াকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠন বলে আবেদন করেছেন।

বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের কাছে নীতি, নৈতিকতা, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ আশা করা মূর্খামি। পাগলকে সাঁকো নাড়াতে বারণ করলে যেমন আরো বেশি করে নাড়ায়, অনেকটা সেরকমই। আর সংখ্যালঘুদের টার্গেট করতে হলে তো কথাই নেই।

এলাহাবাদে, যেখানে 'বাঁশের থেকে কঞ্চি দড়' মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গেরুয়া বসন পরিধান করে ক্ষমতাসীন, সেখানে প্রয়াগরাজ উন্নয়ন পর্ষদ তো আরো বেপরোয়া ভাবে বুলডোজার রাজনীতি করবে। সেটাই তো আশঙ্কা ধর্মোন্মাদদের কাছে।

মাত্র আটটি বছর বিজেপি কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতা দখল করার পর থেকে একটি একটি করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। শুধুমাত্র বার বার মিথ্যা কথা বলে 'লৌহপুরুষ' নরেন্দ্র মোদী সব করতে পারেন। শুধু তাঁকে একটু সময় দিতে হবে। এই সময়টুকুর অবসরে কংগ্রেসের আমলে আগ্রাসী নয়া উদারবাদী পথে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল, কল্যাণকামী অর্থনীতির যে রেশ কংগ্রেস কাটিয়ে উঠতে পারছিল না, সেই কাজগুলোই নির্লজ্জ বেপরোয়াভাবে করল। আর ভোটের রাজনীতিতে কর্পোরেট দুনিয়ার সহায়তার প্রায় কম করেও ত্রিশ শতাংশ ভোট ব্যাংক করার লক্ষ্যে মুসলিম বিরোধী মনোভাব হিন্দুদের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থানের' রাষ্ট্রনীতির বুলডোজার চালিয়ে দিল। বাস্তবে বুলডোজার ঘরবাড়ি দোকানপাট ভাঙার অনেক আগেই মুসলমানদের একঘরে করার লক্ষ্যে আইনের বুলডোজার চালিয়েছে বিজেপি। কাশ্মীরের ৩৭০, ৩৫এ ধারা উচ্ছেদ, সি এ এ - এন আর সি- এন পি আব, অযোধ্যার রামমন্দির স্থাপন—আরো কত কি!

জাভেদ মহম্মদ, ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য এবং এলাকার পরিচিত ব্যবসায়ী। বলা নেই কওয়া নেই, আগাম সচেতনামূলক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া নেই। শোনা যায়, ঘটনা ঘটাবার মাত্র এক ঘণ্টা আগে তাঁকে একটি ব্যাকডেটেড নোটিশ ধরানো হয়। আইনি পদক্ষেপের সুযোগ বন্ধ। বেআইনি নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ চিহ্নিত করে দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তাঁর বাড়ি। অর্থাৎ ভদ্রলোকের দোষ তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান এবং আদিত্যনাথের মনে হয়েছে জাভেদ মহম্মদ নূপুর শর্মার পয়গম্বরবিরোধী ঘৃণা ও সংবিধানবিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন। অর্থাৎ কোনো হিন্দুত্ববাদী কল্পলোক বা অন্তরের অন্তস্থল থেকে সাড়া পেলেই রাষ্ট্রের নিপীড়ন অস্ত্র দিয়ে অবশ্যই সংবিধান, যে কোনো নাগরিক এবং অবশ্যই মুসলমানদের সর্বনাশ করা যায়। আর এই আগ্রাসন ও ধ্বংস যজ্ঞে একটা প্রতিযোগিতা তো আছেই। মোদি বা অমিত তো আর রামের ইজারা পাননি যে, তাঁরা অমৃত আস্বাদন করতে পারেন।

তবে আশার কথা, সম্প্রতি শীর্ষ আদালদ এভাবে বুলডোজার রাজনীতির আগ্রাসনে কারও ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া সংবিধানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং অবিলম্বে এই প্রকল্প থকে সরকারকে সরে আসতেই হবে।

সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির নিরসনে গণআন্দোলন তীব্রতর করেই এগোতে হবে

সাধারণ জনজীবনের সমস্যা অতিদ্রুত সমস্ত সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। সারা দেশ জুড়েই এক জটিল পরিস্থিতি। এমনিতেই কোভিড সংক্রমণ পরবর্তীকালে ভারতের অর্থনীতি আরও গভীর সংকটে নিমজ্জিত। কোনও সংশয় নেই যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই যে অর্থনৈতিক ভাবনা নিয়ে চলেছে তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেশের অধিকাংশ মানুষ বেঁচে বর্তে থাকার দিশা আর খুঁজে পাচ্ছে না। কোভিড সংক্রমণের অস্বাভাবিক দৌরাত্ম্য সমস্যাগুলিকে আরও অনেক বেশি গভীর এবং জটিল করে তুলেছে। কেন্দ্র বা অধিকাংশ রাজ্য সরকারই মানুষের এহেন যন্ত্রণাকাতর হাহাকার, দুবেলা দুমুঠো খাদ্যের অধিকার হারিয়ে আর্ত চিৎকার, সসম্মান জীবিকার সন্ধানে রাত্রিদিন এক করে নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাঁচিয়ে রাখার আকুতি প্রভৃতি কোনোকিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

যে কোনও শাসকের, দেশ বা কালনিরপেক্ষভাবে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ বা দুর্নীতি অবশ্যই দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তঞ্চকতা। আর এদেশের সরকার শুধুমাত্র মানুষের সঙ্গে অনৈতিক বা নীতিহীন সিদ্ধান্তগুলি জোর করে চাপিয়ে দিয়ে তঞ্চকতাই করে চলেছে এমন নয়। ক্রমশ প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সীমাহীন প্রতারণার নিত্য নতুন ফাঁদ নির্মাণ হয়ে চলেছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মন্ত্রী সান্ত্রীরা বিগত কয়েক বছরে কত হাজার কোটি অর্থ বা টাকা আত্মসাৎ করে নিজেদের বিত্তবৈভবের অশ্লীল প্রদর্শন করে চলেছেন, সেই দুর্নীতিকে অবশ্যই অবহেলা করা ঠিক নয়। কিন্তু এইসব রাজনীতিকরা পরিকল্পনা করে কত সংখ্যক মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে তাঁদের ভ্রান্ত পথে যেতে বাধ্য করেছেন, তা আরও বেশি দুর্নীতিমূলক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব অপরাধী নেতা মন্ত্রীরা নিতান্ত গোবেচারা বা অসচেতন হয়েই এমন বহুসংখ্যক গর্হিত অপরাধ ক্রমাগত করেই চলেছেন। তা মনে করার কোনও যুক্তি নেই।

দেশের সর্বত্র জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস বা কেরোসিন তেল সবকিছুই মহার্ঘ তো বটেই। নেহাত যেসব খাদ্যদ্রব্য না হলে মানুষের জীবন চলে না, মানুষ ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারেন না যেমন, চাল, ডাল, আটা প্রভৃতির দামও ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ভোজ্য তেল বিশেষত, সরষের তেলের দাম তো বেশ কিছুকাল ধরে দুশো টাকার নীচে যাচ্ছেই না। লাভবান হচ্ছে মোদির অতি ঘনিষ্ঠ গৌতম আদানি বা পতঞ্জলির মালিক রামদেব। নকল সাধুর বেশে বেশ অনেক বছর যোগ ব্যায়ামের কসরৎ দেখানো লোকটি এখন সহস্র কোটি টাকার মালিক। সহায় নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। 'মহাকোষ' তেল বা 'ফরচুন' এখন বিজ্ঞাপনের অঢেল আয়োজনে দোকানে দোকানে শোভা পাচ্ছে। এদের অতি মুনাফা নিশ্চিত করতে মোদি সরকার সর্ববিধ আয়োজনে মত্ত। এইসব স্যাঙাৎ পুঁজিপতিরা পরম নিশ্চিন্তে অতি মুনাফার টাকা জড়ো করছে আর সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। কোনও প্রতিকারের সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। অন্তত সরকার কিছুই করবে না।

আর গৌতম আদানির বিপুল অঙ্কের কর্পোরেট কোম্পানি মোদির বদান্যতায় প্রতিনিয়ত ফুলে ফেঁপে উঠছে। শুধু কি কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা! মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় গেলেন। সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন সম্ভবত অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির কুশীলব স্কট মরিসন। তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রবল দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রধান কারবারি মোদির গলায় গলায় ভাব। মোদি মাঝে মধ্যেই জড়িয়ে ধরেন সেই প্রধানমন্ত্রীকে। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের শেষের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এদেশের অসংখ্য মানুষের স্বার্থপূরণে কোনও বাক্য উচ্চারণ করলেন না। তিনি নিতান্ত বানিয়াসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে গৌতম আদানির জন্য ওই দেশে কয়লাখনির ব্যবসার সুযোগ করে দিতে অনুরোধ করলেন। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে কামমাইকেল খনির মালিক হয়ে বসলেন আদানি। তাঁর এক পয়সার বিনিয়োগও প্রয়োজন হল না। মোদি ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার লগ্নির ব্যবস্থা করলেন। দেশের আপামর মানুষের অর্থ নিয়ে পুষ্ট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে বাধ্য।

কুইন্সল্যান্ডে খনি ব্যবসার শুরুতেই বাদ সাধলেন ওই দেশের বহুসংখ্যক পরিবেশ কর্মী। আদানির সাধের খনি ব্যবসা হোঁচট খেল। লোকসান অবশ্য ভারতের জনগণের। কারণ, গৌতম আদানির পিতৃপুরুষের টাকা তো আর আটকে গেল না। কোম্পানির কোনও লাভ বা লোকসান নেই। লোকসান হতে শুরু করল স্টেট ব্যাঙ্কের। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবং ওই দেশের পরিবেশ বা প্রকৃতি ধ্বংসের অপরাধ স্খালনের সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবশেষে কুইন্সল্যান্ডে গৌতম আদানির খনি ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল। ঠিক তখনই মোদি স্বয়ং ঝাঁপিয়ে পড়লেন কয়লা ব্যবসায়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আদানির পকেট ভরতে। ভারতের কোল ইন্ডিয়া নাম রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হল অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা কয়লা দেশের সবকটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করতেই হবে। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি পুঁজিপতির অঢেল বা অপরিমেয় মুনাফা নিশ্চিত।

এরপর ৪ পাতায়

শাহিনবাগেও প্রতিবাদে স্থগিত বুলডোজারের অগ্রগমন

জাহাঙ্গীরপুরীর পর এ বার শাহিনবাগ। ফের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দিল্লীর শাহিনবাগে উচ্ছেদ অভিযানে নেমে ছিল বিজেপি পরিচালিত দক্ষিণ দিল্লীর পুরনিগম। ৯ মে, সকাল ১০টা নাগাদ পুরনিগমের কর্মীরা বুলডোজার নিয়ে জি ডি বিড়লা মার্গে পৌঁছালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা, আম আদমি পার্টি, কংগ্রেসের সমর্থকেরা বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজনদের কাছে বাধা পেয়ে ও দোকানদারেরা নিজেরাই অল্প কিছু অস্থায়ী কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ায় (এলাকার সমস্ত দোকানই বৈধ) বেলা দেড়টা নাগাদ বুলডোজার নিয়ে ফিরে যান পুরকর্মীরা।

প্রসঙ্গত, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বুলডোজার একটি নিছক যন্ত্রমাত্র নয়, সম্প্রতি সংখ্যালঘু উৎপীড়নে একটি 'রূপক' হিসাবেই এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। শুধু শাহিনবাগ বা জাহাঙ্গীরপুরেই নয়, দেশ জুড়ে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বুলডোজার ব্যবহৃত হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরেই উৎপীড়নের যন্ত্র হিসেবে।

উদাহরণ অজস্র ঃ— মধ্যপ্রদেশের খরগোন, শ্যোপুরে, ভোপাল শহরে একটি সংখ্যালঘু পরিচালিত কলেজ ও স্কুল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কর্নাটকের উদুপি শহরে হিজাব প্রতিবাদ সমর্থন করায় মুসলিম পরিবারের একটি রেস্টুরেন্ট গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বুলডোজারের বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যোগী আদিত্যনাথ তাঁর ভক্তকুলের মধ্যে 'বুলডোজার বাবা' নামে পরিচিতি পেয়েছেন। মধ্যপ্রদেশেও মুখ্যমন্ত্রীও অধুনা 'বুলডোজার মামা' নামে উল্লেখিত হচ্ছেন। তিনি এখন যোগী অনুগামী।

বুলডোজার এখন মুসলিম সমাজের কাছে যন্ত্রণাময় নিরাপত্তাহীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে ভোলবদল

পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে, রাষ্ট্রদ্রোহ মামলাটি শীর্ষ আদালতের হাতে ছেড়ে দিলে বিষয়টি কেন্দ্রের পছন্দমত দিকে নাও গড়াতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে কেন্দ্র হলফনামা দিয়েছে বিষয়টি তারা পুনর্বিবেচনা করতে পারে। হঠাৎ কেন এই ভোলবদল? সরকার পুনর্বিবেচনা এবং পুনরায় পরীক্ষার কথা বললেও, প্রশ্ন হল পুনর্বিবেচনা করা মানে তো আইন বাতিল করা নয়, দ্বিতীয়ত কত দিনের মধ্যে সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ততদিন আইন বহাল থাকছে, আসলে এটা বিষয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখার কৌশলও হতে পারে। আবার শোনা যাচ্ছে, সরকার বিষয়টি পার্লামেন্টেও পেশ করতে পারে, তাহলে পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের জোরে নতুন করে নবকলেবরে বিষয়টি আইনানুগ করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

পুলিশের অন্যায়ের কথা স্বীকার করলেই সমস্যার সমাধান হয় না

পুলিশ অন্যায় করলে তার দায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কাম পুলিশমন্ত্রী এড়াতে পারেন না। পুলিশ অন্যায় করেছে, তার জন্য সরকারের মুখ পুড়েছে—এই অভিযোগের জবাবে পুলিশের কিন্তু কিছুই করার নেই। হরেক রকম স্বার্থে মোটা সুতোয় পুলিশের হাত বাধা, মুখ বাধা। তাদের প্রতিবাদের কোনো উপায় নেই। প্রশাসনের নানা স্তরে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পুলিশের উপর শাসক দলের ছোট, বড়, মাঝারি নেতাদের নিয়ন্ত্রণ অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য। পুলিশের আচরণে সরকারের মুখ পুড়লে তার দায় সরকারের উপর বর্তাবেই। তাছাড়া বিচিত্র সব সমস্যায় জর্জরিত পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক অঙ্গুলি হেলনে চালিত পুলিশের সত্যিই বড় অসহায় অবস্থা, বালি খাদান, গাছ কাটা, পাথর খাদান, সিন্ডিকেট, গরু পাচার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপুল অঙ্কের টাকার লেনদেন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক হিংসা ঘটে চলেছে তার মূল কারণ টাকা। শিল্পহীন এই রাজ্যে রাজনীতিই অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থানের বৃহত্তর ক্ষেত্র। সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজন রাজনীতির সঙ্গে অর্থ উপার্জনের নাড়ীর সংযোগ ছিন্ন করতে হবে। পুলিশের উপর সব দোষ চাপালে চলবেনা।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা!

ধারাবাহিকতা সদাই কাঙ্ক্ষিত বিষয় নাও হতে পারে। বিশ্বে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার সূচীতে (World Press Freedom India) ভারতের বেশ কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিক ভাবে অবনমন ঘটছে। এই বিষয়ে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেল, যে ১৮০ টি দেশের সমীক্ষা হয়েছিল তার মধ্যে ভারতের অবস্থান ১৫০। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এই পতনের হার আরও দ্রুত হয়েছে। সুবিদিত ঘটনা, প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন না, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের মুখে পড়তে তাঁর প্রচণ্ড অনীহা। এতদসত্ত্বেও মোদী জমানায় তাঁর দলের সঙ্গে প্রচার মাধ্যমে বিশেষত প্রভাবশালী বড় বড় ব্যবসায়ী পরিবারের এক অভাবনীয় সখ্য নির্মাণ হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণই এই জমানার একমাত্র চারিত্র বৈশিষ্ট্য নয়। আইনি অস্ত্রগুলি ব্যবহার করে বিরুদ্ধ মতের প্রচার করা গণমাধ্যমের হেনস্থা করাটাও বর্তমানে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেশদ্রোহী আইন (১২৪এ) বর্তমান সরকারের এক পছন্দের অস্ত্র। মানতেই হবে এই উপসর্গগুলি সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে সুলক্ষণ নয়।

হিসাব মিলছে না

বলা হয়েছিল এ বছর রেকর্ড পরিমাণ গম উৎপাদন হবে। ১১১.৩ মিলিয়ন টন। এখন সরকারি অভ্যন্তরীণ হিসাব বলছে ৯৮ মিলিয়ন টন। দেশে গমের রেকর্ড পরিমাণ ফলনের দাবি সত্ত্বেও আচমকা বিদেশে গম রপ্তানি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল সরকার। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বিদেশে গম রপ্তানি বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। বেশ কয়েকটি দেশে গম রপ্তানির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদেরও পাঠানো হয়েছিল। 'বাম্পার' উৎপাদনের কথা মাথায় রেখেই এত সব কর্মকাণ্ড! খোদ প্রধানমন্ত্রী জার্মানীতে বলে এসেছিলেন দিন কয়েক আগে বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন অনুমতি দিলে ভারত বাকি বিশ্বকে খাদ্যশস্যের জোগান দিতে এগিয়ে আসতে পারে। দেশের গম চাষিরা যখন বিদেশে গম রপ্তানি করে বাড়তি রোজগারের আশায় অপেক্ষা করছিলেন, তখনই হঠাৎ বিদেশে গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এই মরসুমে রেকর্ড ফলনের আশা থাকলেও, দ্রুত গরম পড়ায় এবং মার্চে প্রবল দাবদাহের কারণে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেমে আসে। উপরন্তু চিনেও দাবদাহের কারণে গম নষ্ট হওয়ায় বিপুল পরিমাণ ভারতের গম সংগ্রহ করছিল চিন সরকার। এতে আগামি দিনে দেশের মানুষের খাদ্য সুরক্ষা বিপন্ন হতে পারে বলে, কেন্দ্রীয় সরকার গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আসলে সরকার চাষিদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ গম কিনতে পারেনি। যদি সরকার ঠিক পরিমাণ গম কিনত, তাহলে রপ্তানি বন্ধ করার প্রয়োজন হত না। সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে চাষীরা আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি দামে গম বিক্রির সুযোগ হারাল। মুখে অনেক লম্বা চওড়া কথা বললেও বিজেপি সরকারও নীতি পঙ্গুত্বে ভুগছে। হঠাৎ গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্তে তারই প্রতিফলন ঘটছে।

কাশ্মীরে ব্যক্তি হত্যা চলছেই

কাশ্মীরে একের পর এক ব্যক্তি হত্যা চলছে। লাগাতার অ-মুসলিমদের হত্যা রুখতে না পেরে কার্যত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দিশাহারা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ধারণা, বেছে বেছে হিন্দু শিখদের হত্যা করার কৌশল নিয়ে এক আতঙ্কজনক পরিবেশ সৃষ্টির কৌশল নেওয়া হয়েছে। এমন অনভিপ্রেত কাণ্ড আটকাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও আধা সামরিক বাহিনীর কোনো কৌশলই কাজে লাগছে না। জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পর সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রবল উপস্থিতির জন্য জঙ্গিরা মনে হয় অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের দ্বারা এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির কৌশল নিয়েছে। নিশানা হিসাবে অ-মুসলিমদের বেছে নিয়ে সমাজে বিভাজন ঘটাতে চাইছে জঙ্গিরা। জঙ্গিরা অবশ্য মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের রেয়াত করছে না।

তাছাড়া সরকারও কাশ্মীরি যুবকদের জঙ্গি দলে নাম লেখানোর প্রবণতা বন্ধ করতে ব্যর্থই হয়েছে। কোনো ভাবেই স্থানীয় যুবকদের জঙ্গি দলে নাম লেখানো আটকানো যাচ্ছে না। নব নিযুক্ত জঙ্গিরা স্থানীয় দুষ্কর্মে 'ইন ফর্মার' হিসাবে কাজ করছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমান। এমতাবস্থায় আগামী দিনে সামগ্রিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে। রাহুল ভট্টের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও রাস্তায় আন্দোলনের পথ বেছে নিতে চলেছে। ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে জম্মু কাশ্মীরের বিজেপি বেশ অস্বস্তিতেই আছে।

সংখ্যাগুরুর আধিপত্য বিপজ্জনক

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন দেশে সংখ্যাগুরুর আধিপত্য কায়েম করার জন্য যে সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে তা ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক, মনে করছেন। রাজনের মতে সংখ্যাগুরুর আধিপত্য নির্মাণের দিকে যেভাবে দেশ এগোচ্ছে তা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ বিপজ্জনক। তাছাড়া, সংখ্যাগুরুর আধিপত্য সমাজে বিভাজন ডেকে আনে। ভারত এখন বাইরে থেকে আসা অনেক বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ফলে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। রাজনের বিশ্বাস, ভারতের বৃদ্ধিতে সকলকেই সামিল হতে হবে। সমাজের কোনো অংশের নাগরিকদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করলে কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি কোভিড-পূর্ববর্তী, তা এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক জন প্রাক্তন গভর্নরের কথায় অভিনবত্ব না থাকলেও, অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অস্থিতিশীল আন্তর্জাতিক রাজনীতি

আগামী দিনগুলিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্থিরতা আরও বাড়বে বলেই মনে হয়। ইউক্রেন সঙ্কটের সমাধান সূত্র এখনও পাওয়া যায়নি। শীঘ্রই পাওয়া যাবে তারও কোনো ইঙ্গিত নেই। ন্যাটোর ক্রমাগত পূর্বদিকে সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য রাশিয়া ইউক্রেনে সৈন্য পাঠালেও বাস্তবে উল্টোফলই হয়েছে। প্রথমে ফিনল্যান্ড এবং তারপর সুইডেন ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করছে, ন্যাটোর সদস্যপদের তালিকায় ইতিমধ্যেই রয়েছে নরওয়ে, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া। অর্থাৎ রাশিয়ার একটা দিকে পুরোপুরি ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলি রাশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে চলেছে। রাশিয়ার হুমকি রাশিয়াও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেই।

সেই পাল্টা ব্যবস্থা কী হতে চলেছে তা নিয়ে জল্পনা চলছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই টালমাটাল অবস্থার প্রতিফলনও স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতিতেও পড়ছে, আর্থিক বাজারের অস্থিরতা ছাড়াও, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ভারতের দুটি প্রধান সমস্যা। অপরিশোধিত তেলের মূল্য কমার কোনো লক্ষণ নেই। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব বাড়ছে আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারেও। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াচ্ছে। অনিশ্চয়তার জন্য টাকা বনাম অন্যান্য বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার ক্রমাগত পরিবর্তিত হলে, অস্থিরতা আসবেই এবং মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে।

এমন এক পরিস্থিতির মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথাযথ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখেই নীতি পরিবর্তন করতে হবে।

এমন এক পরিস্থিতির মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথাযথ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখেই নীতি পরিবর্তন করতে হবে।

ভারতীয় শিল্পপতিদের ব্যাঙ্কের টাকা লুট প্রসঙ্গে

যে ২৮ জন শিল্পপতি ব্যাঙ্কের টাকা লুট করেছেন তার মোট পরিমাণ ১০ ট্রিলিয়ন টাকা। এই ব্যাঙ্ক লুঠেরাদের মধ্যে কোনো মুসলমান, কোনো খালিস্তানি, কোনো উগ্রপন্থী, কোনো নকশাল, কোনো বাঙালি, কোনো এস সি, এস টি, ওবিসি ... কোনো নাম নেই। এবং এই ২৮ জনের মধ্যে শুধুমাত্র বিজয় মালিয়া ছাড়া বাকি সবাই গুজরাটি। এদেরই লুঠ করা সম্পদে দেশ যখন সর্বস্বান্ত তখনি সরকারের নজর পড়েছে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উপর, এই মুনাফালোভী কুচক্রী দেশের শত্রুদের আনুকূল্যে লোকসান সামলাতে, এল আই সি, বি এস এন এল, বিমান পরিবহণ, রেল-এর মতো লাভজনক সংস্থার বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে।

৪৩-এর মন্বন্তরে ফ্যান দাও, ফ্যান দাও-এর হাহাকার হয়তো আর শোনা যাবেনা। আম্বানি, আদানিদের হাতে দেশের শস্য ভান্ডার তুলে দেওয়া ফন্দি আঁটছে সরকার, চাষির কাছ থেকে জলের দরে শস্য কিনে গুদামজাত করা হবে, এবং বাজারে দাম বাড়িয়ে বেচা হবে। গরিব হা ঘরে মানুষদের কাছে খাওয়ার জন্য, ফ্যানও পাওয়া যাবে না।

আচ্ছা দিনের স্বপ্নেই মশগুল থাকতে হবে ভারতবাসীকে।

রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ একটি সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক চাল

তুষার চক্রবর্ত্তী

বাংলাভাষা নিয়ে রাজনৈতিক আবেগ যত বাড়ছে, শুদ্ধ বাংলার প্রয়োগ ততোই কমে আসছে। শিরোনামে সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক চালের বদলে সাম্রাজ্যবাদী প্রপঞ্চ কথাটা প্রয়োগ করা যথাযথ হতো। অচেনা শব্দে পাঠক বিব্রত হতে পারে ভেবে তো কথাটা ঘুরিয়ে বলতে হলো। প্রপঞ্চ কথাটি ইংরেজি ফেনমেনন কথাটির সমার্থক শুধু নয়—আরো মর্মভেদী। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ যে বর্তমান বিশ্বের জটিল ও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের মূর্ত বহিপ্রকাশ—অর্থাৎ বাস্তবিক অর্থে একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রপঞ্চ—এই ধারণাকে সামনে রেখেই আলোচনা শুরু করতে চাইছি। এই যুদ্ধে কোন পক্ষ ঠিক কোন পক্ষ ভুল সেই তর্কে প্রবেশ করাটাই হবে সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদে ভুল করে পা এগিয়ে দেওয়া।

প্রপঞ্চ কথাটির আরেকটি বিশেষ ইঙ্গিত—ঘটনার মোড়ক হিসেবে, ঘটনাকে আড়াল করার জন্যে, 'মায়া' বা ছলনার আশ্রয় নেওয়া। সাধারণের কাছে সেটাই প্রদর্শিত হয়। যা দেখছি, তা আসল ঘটনাকে আড়াল করে। এ যুগে সাম্রাজ্যবাদ জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সতত এই কাজটাই গুছিয়ে করে থাকে। যেমন, রুশ ইউক্রেন যুদ্ধকে ইউক্রেনের জাতিসত্তার বিরুদ্ধে রুশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন হিসেবে কর্পোরেট লালিত সংবাদমাধমে দেখানো হচ্ছে। যদিও—এই সংঘাতের অন্যতম কারণ যে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী সামরিক যুদ্ধজোট ন্যাটোর সম্প্রসারণের সঙ্গে রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব, যেখানে ইউক্রেনকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে, তা কদাচ বলা হয় না। সোজা কথা—এই যুদ্ধে পুতিনের রুশ সাম্রাজ্যবাদকে কোণঠাসা করছে ন্যাটো ও তার পেছনে থাকা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থের সংঘাতই এই যুদ্ধের পটভূমি। দুনিয়ার শ্রমজীবি মানুষের তাই এই যুদ্ধে কোনো পক্ষাবলম্বনের প্রশ্ন উঠতে পারে না। শ্রমজীবি মানুষদের, যে কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতো এই যুদ্ধেরও সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা সঠিক অর্থেই পুতিনকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়। ভারত রাশিয়ার সস্তা দরের জ্বালানির লোভে সেই সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে আলাদা করে। বিশ্বরাজনীতিতে, এবং ভারতের শান্তিপ্রিয় যুদ্ধবিরোধী নৈতিক অবস্থান থেকে যা সরে এসেছে। এককথায়, এ ব্যাপারে ভারত সরকার নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। ভারতের অবস্থান আরো শিথিল হয়েছে এই কারণে যে এই যুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও রাজনীতির অংশ—সেটাও ভারতের তরফে বলা হয় নি। যদিও, আগামী দিনে মার্কিন ও চিনের সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বে ভারতকেও এভাবেই বলির পাঁঠা বানানোর সম্ভাবনা দিনে দিনে বাড়ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দিলেও—ভাঙ্গা সোভিয়েতের চিতার ওপর গড়ে ওঠা জীবাশ্ম জ্বালানি ও পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রিক যে রুশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়েছে, বিশেষত ইউরোপে তা পশ্চিমের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। মার্কিন মদত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দেবার সময় এই রুশিয়ার প্রধান দুই সহযোগী ছিল ইউক্রেন ও বেলারুশ। রুশ, ইউক্রেন ও বেলারুশ এই তিন দেশই মিলিত ভাবে সোভিয়েত ভেঙ্গে ফেলার অপকর্মটি করেছিল। মার্কিন মদতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়াকে মঞ্চে নামানো হয়। অতঃপর, ইউক্রেনকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়াকে সামরিকভাবে ঘিরে ফেলা ও নিয়ন্ত্রণে আনার চক্রান্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কয়েক দশক আগেই শুরু করে। প্রায় এক দশক হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই উদ্যোগে পুরোদস্তুর সামিল হয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নিজেদের শাসক বদলের মার্কিন কৌশল কাজে লাগিয়ে। অবশেষে ২০১৪ সালে নিওফাসিস্ট সহ নানা ধরনের বিদ্রোহীদের জড়ো করে তৈরি করা ইউরোমায়দান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ভিক্টর য়ানুভিচকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইউক্রেনে ক্ষমতায় বসানো হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ন্যাটোতে অংশগ্রহণের পক্ষপাতি একের পর এক পুতুল সরকার। বর্তমান জেলেনস্কি সরকারও যার সর্বশেষ নিদর্শন। রাশিয়ার নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ইউক্রেন-রুশ সংঘাত যুদ্ধের রাজনীতির রূপ নিয়েছিল। যদিও, এই যুদ্ধ অসম। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি ইউক্রেনের কখনো ছিল না। আর, সরাসরি ন্যাটোর বাহিনীকে ইউক্রেনের হয়ে যুদ্ধে নামাবার সাহস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। কেননা, এমনটা করলে তা অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেহারা নেবে। অন্যদিকে, রাশিয়া চায়, ইউক্রেনের বন্দরগুলির দখল, যাতে তারা নৌবাহিনীর সমুদ্রপথ খোলা থাকে। চায়, ইউক্রেনের ইউরেনিয়াম ও বিপুল পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরির ব্যবস্থাকে কব্জায় রাখতে, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গবার পরেও চুক্তি মাফিক রয়েছে রাশিয়ার হাতে। আর ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে একটি দেওয়াল হিসেবে রাশিয়ার অধীনস্থ কোনো দেশ বা অঞ্চলকে খাড়া রাখতে চাইছেন পুতিন—যা কোনো অন্যায় আবদার নয়। জার্মানির সংযুক্তি ও ওয়ারশ সামরিক জোট ভাঙ্গার সময় রাশিয়ার দিকে ন্যাটোর সম্প্রসারণই স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যা এখন ভঙ্গ করা হচ্ছে।

সুতরাং, ইউক্রেনের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার তাল ও তা রুখবার জন্য রাশিয়ার আগ্রাসন সাম্রাজ্যবাদী ভূরাজনীতির চাল ও টক্কর। কিন্তু, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে সাম্রাজ্যবাদী কোনো পক্ষই এখনো প্রস্তুত নয়। যদিও, আতংক ছড়াবার জন্য কোনো কোনো মহল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এমনটাও বলছে। নীতি নৈতিকতার কথা যদি তোলা হয়, তাহলে, পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী জোটের কাছে প্রশ্ন—ইউক্রেনে হামলার জন্য যেমন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ ঘোষিত হচ্ছে, ইয়েমেন আক্রমণকারী সৌদি আরবের বিরুদ্ধে তা কেন হচ্ছে না? রুশ আক্রান্ত ইউক্রেনের হয়ে যারা যুদ্ধ করছে তাদের মুক্তিযোদ্ধা বলা হলে, ইসরায়েল আক্রান্ত প্যালেস্টাইন যোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা না বলে সন্ত্রাসবাদী বলা হয় কেন? কেন পশ্চিমী রাজনীতি ও সংবাদমাধ্যমের এই দ্বিচারিতা?

এই সংঘাত চিনের আপাত নিশ্চুপ ভূমিকা নিয়েও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ মুখর। চিন যে পুতিনকে আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন যোগাচ্ছে তা কোনো লুকোছাপার ব্যাপার নয়। কেউ কেউ দাবি করছে—চিনের পুতিনকে সমর্থনের কারণ—এরপর চিন তাইওয়ান আক্রমণ ও দখল করলে রাশিয়া নাকি চিনকে সহায়তা করবে। বাস্তবে, চিন রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের নিন্দা না করলেও, এ ব্যাপারে রাশিয়াকে যে সামরিক বা রাজনৈতিক সাহায্য করছে, রাশিয়ার হয়ে প্রচার করছে তা কিন্তু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধে চিনকে কাবু করতে না পেরে এখন চিনের বিরুদ্ধে অঘোষিত আর্থিক অবরোধের রাস্তা নিয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ, বিশেষত তেল ও গ্যাস আমদানির প্রতিবন্ধকতা পরোক্ষে চিনের বিরুদ্ধে ও চিনকে কাবু করার অস্ত্র। ইউক্রেনে রুশ আক্রমণ এই দুই পক্ষ ছাড়াও— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও চিন যেভাবে জড়িয়ে আছে তা আজকের বিশ্বে নবীন ও প্রবীণ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সংকট ও প্রতিযোগিতার জটিল সংঘাত ছাড়া কিছু নয়।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়িয়ে এই যুদ্ধের খরচ সামলাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। খানিকটা এই তেলের দামের থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ভারতকে ও রাশিয়াকে না চটানোর সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আর, তার ফলে নানা ছলছুতোর আশ্রয় নিয়ে মার্কিন, পশ্চিমী ও আরব দুনিয়ার সম্মিলিত রাজনৈতিক প্রচার মোদি ও বিজেপির ওপরে এবার বর্ষিত হচ্ছে। না হলে, ভারতে বিজেপি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি কি আচরণ করছে—এমকি গুজরাট সহ অন্যান্য দাঙ্গার সময়েও তা আরব শেখেদের তো কখনো তেমন বিচলিত করেনি। রাশিয়ার তেলের বাজার ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার ফলে এদের ধর্মভিত্তিও এখন তুঙ্গে।

ইউক্রেন ও রুশ যুদ্ধ যে দিনে দিন দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। দুনিয়ায় শ্রমজীবি মানুষের আন্দোলন, সংহতি ও দুনিয়াজোড়া বামপন্থী ছন্নছাড়া অবস্থা সাম্রাজ্যবাদীদের সংকটকে নিরন্তর সংঘাত ও যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে শুধু শান্তি নয়—পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে মারাত্মক। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চালে বিভ্রান্ত না হয়ে, এক বা অন্য পক্ষ অবলম্বন না করে, দুনিয়ার শ্রমজীবি মানুষদের মধ্যে সংযাগ ও সংঘবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী প্রতিরোধ তৈরী করেই এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে বদলে ফেলা দরকার। সেটাই এই সময়ের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে ২১ জুন কলকাতায় মহামিছিল

১৩ জুন বিকালে রাজ্যের ১৬টি বামপন্থী ও সহযোগী দলসমূহের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত কয়েকদিন আগে বিজেপির দু'ই মুখপাত্র প্রকাশ্যে হজরত মহম্মদ সম্পর্কে উস্কানিমূলক অবাঞ্ছিত মন্তব্য করে বস্তুত সমগ্র দেশে জনগণের মধ্যে **ঐক্য ও সংহতির শক্তিকে** দুর্বল করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতি সমূলে ধ্বংস করা এবং জনগণকে বিভাজিত করার ধারাবাহিক গভীর চক্রান্তের প্রতিভাস এই ধরনের মন্তব্য। বিজেপির মুখপাত্ররা এমন কুৎসিত উচ্চারণের মাধ্যমে দেশের সংবিধানের মূল নির্যাসকেও বিপর্যস্ত করেছে। এ ধরনের গর্হিত অপরাধ বিজেপি ও আর এস এস ক্রমাগত করেই চলেছে। এই গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও অপরাধীদের কোনও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসক দল এখনও এদের বাঁচানোর অপচেষ্টা করেই চলেছে।

এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গেও শাসক দলের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নকারী ঘটনা ঘটে চলেছে। জনগণের সামগ্রিক ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য উপরিউক্ত জঘন্য ঘটনা ও উক্তিগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাম ও সহযোগী দলগুলিকে এপ্রসঙ্গে সচেতন থেকেই শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রসঙ্গে অবিলম্বে রাজ্য জুড়ে 'শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার্থে ১৫-২১ জুন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ' পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২১ জুন কলকাতায় বেলা ৩.৩০ টায় রামলীলা ময়দানে জমায়েত হয়ে মহাজাতি সদন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মিছিল সংগঠিত করা হবে।

বিভিন্ন জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জেলায় অবস্থানকারী বামপন্থী ও সহযোগী দলসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা করে কর্মসূচি নির্দিষ্ট করতে অনুরোধ করা হয়েছে। জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ককে এব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে অতিরিক্ত তৎপরতা নিয়ে যোগাযোগ করে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জেলার কর্মসূচি নিয়ে কথাবার্তা বলতে এবং একইসঙ্গে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের ও জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৩ জুনের সভায় উপস্থিত ছিল—

সিপিআই (এম), সিপিআই, এআইএফবি, আরএসপি, সিপিআই (এম এল) লিবারেশন, এসইউসিআই (সি), আরসিপিআই, এমএফপি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বলশেভিক পার্টি, সিআরএলআই, সিপিবি, পিডিএস, এনসিপি, আরজেডি, জেডি (ইউ)

সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির নিরসনে....

১-এর পাতার পর

মোদি অবশ্য এখন থেকেই উতলা ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হবে, তার সুচারু ব্যবস্থা করতে। আদানি তো বিজেপির অন্যতম বড় দাতা! ইলেক্টোরাল বন্ডের মারফৎ বিজেপি এখন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী রাজনৈতিক দল।

রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার পেলে এমন অরাজক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিজের পছন্দমতো ব্যক্তির প্রভূত সুবিধে করে দেওয়া অবশ্যই সম্ভব। পার্লিয়ামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য থাকলে কোনও প্রশ্নই করা যাবে না। করলেও চিৎকার করে সেই অবাধ্য প্রশ্নকর্তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া সম্ভব। তা-ই হয়ে চলেছে। মোদি-অমিত শাহরা এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওরা বিলক্ষণ অবগত যে, মোদি সরকারের কৃতকর্মের ওপর নির্ভর করে আগামী ভোটে কিছুতেই উতরানো সম্ভব নয়। নতুন নতুন ফন্দি করতে হবে। মোদির দল বা সংঘ পরিবার নির্দিষ্টভাবে হয়তো মনে করে—কনভিনস্ অর্থাৎ বুঝিয়ে রাজি করাও—না পারলে কনফিউজ অর্থাৎ বিভ্রান্ত কর। আর তাতেও সাফল্য না এলে শেষতম 'সি' অর্থাৎ করাপ্ট করে দাও। মানুষকে অনৈতিকভাবে প্রচুর টাকা দিয়ে তাঁদের 'মস্তিষ্ক প্রক্ষালন' করে দাও।

বহু টাকার বিনিময়ে ভোট বৈতরণী পেরিয়ে আবার ভারতের শাসন ক্ষমতা কব্জা করতে যে পরিমাণ অর্থের দরকার, তা নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত ক্ষুদ্র দানে সম্ভব নয়। রাশি রাশি কালো টাকা আসবে কর্পোরেটদের তহবিল থেকে। বানিয়া প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার 'ডিল' করতে আসরে অবতীর্ণ। তিনি শ্রীলঙ্কার চরম সংকটকে তাঁর অপার সুযোগ বলে ধরে নিয়েছেন।

ওই দ্বীপরাষ্ট্রের অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির প্রধানতম নেতা মাহিন্দা রাজপক্ষে। নৃশংসভাবে দ্বীপরাষ্ট্রের তামিল জনগণকে পর্যুদস্ত করা হয়েছিল এই রাষ্ট্রনায়কের শাসনকালেই। তামিল ইলমের অবশ্যই প্রচুর দোষ ছিল। কিন্তু যেভাবে গণহত্যা সংগঠিত করে নিরপরাধ নারী শিশুসহ তামিলভাষী হবার অপরাধেই লক্ষাধিক মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা, তাঁদের বাসগৃহে আগুন ধরিয়ে সবকিছু ধ্বংস করা মানবিক বিচারে অতি গর্হিত অপরাধ। আন্তর্জাতিক বিচার হওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। হয়নি।

শ্রীলঙ্কায় মোদির বানিয়াগিরি

তামিল জনগোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করার পরেই শ্রীলঙ্কার অধিবাসী ইসলামধর্মী মানুষদের নির্দিষ্টভাবে বিরুদ্ধতা করা শুরু হয়। কুশীলব সেই রাজপক্ষে পরিবার। প্রশাসনিক বিচারে অপদার্থ এবং দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেই চলাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তারা কল্পিত শত্রুর অবস্থান খুঁজে বের করে এবং তাদের নিকেশ করার জন্য অন্য এক অংশকে ক্ষেপিয়ে তোলে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উগ্র সাম্প্রদায়িক একাংশ মানুষকে নৃশংস আচরণে প্ররোচিত করা হয়।

শ্রীলঙ্কার বর্তমানে গভীর সংকট। মানুষ খাদ্যের জন্য, পানীয় জলের জন্য, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য হাহাকার করছে। সকলেই জানেন যে, এই গণরোষের পর মাহিন্দা রাজপক্ষে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে যাবার পথ পাচ্ছেন না। তাঁর ভাই গোতাবায়া এখনও রাষ্ট্রপতি পদে আসীন। লক্ষ লক্ষ শ্রীলঙ্কাবাসী সোচ্চার তাঁর পদত্যাগের দাবিতে। তাঁরা সর্বত্র আওয়াজ তুলেছেন 'গোতাবায়া গো'। আর প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের চরম দুর্দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেই গোতাবায়াকে ধরে গৌতম আদানির ব্যবসা পরিব্যাপ্ত করার অপকর্মে অবতীর্ণ। ওই দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির বরাত পেতে মোদি অনুরোধ করেছেন শ্রীলঙ্কার জনসমাজের কাছে সেই খলনায়ক গোতাবায়াকেই। বানিয়া প্রধানমন্ত্রীর রকমসকমে ভারতবাসী হিসেবেই লজ্জাই হয়। এসবই করে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি।

তিনি অর্থাৎ, দেশের প্রধানমন্ত্রী লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি, ভারতীয় মুদ্রার দামে ক্রমাবনতি অথবা সংক্ষেপে চরম অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের জন্য আদৌ চিন্তিত বলে বোধ হয় না। সমাধানের কোনও চেষ্টাই নেই। তিনি সাম্প্রদায়িক বিভেদ আরও জোরকদমে বাড়িয়ে দেবার এবং জনগণের বৃহদংশের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপকর্মে প্রবৃত্ত। অযোধ্যার পরে এখন কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদ, মথুরার ইদগা মসজিদ প্রভৃতি ভেঙে ফেলার নীল নকশা দ্রুত তৈরী করতে মদত দিয়ে চলেছেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলিকে। সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় উত্তেজনার মধ্যে মজিয়ে দিয়ে জনজীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে নজর সরিয়ে দেবার সার্বিক ষড়যন্ত্র চলছে।

সারাদেশ জুড়ে 'জয় শ্রীরাম' গোছের আওয়াজ তুলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করার প্রকল্প চলছে সেই ২০১৪ সাল থেকেই। ক্রমাগত জাতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রসার চলছে। কেন্দ্রীয় এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার এমন অনৈতিক কাজে সহায়ক। তারা নির্দিষ্টভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার প্রকল্প অনুসরণ করছে। সংঘ পরিবার বহুকাল ধরেই এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভবে সক্রিয়ভাবে সামিল। তারা মুসলমানদেরই দেশের প্রধান শত্রু বলে প্রচার বা অপপ্রচার করে চলেছে। যেমন, জার্মানীর সেই চরম নৈরাজ্যের অন্ধকারময় সময়কালে নির্দিষ্টভাবে ইহুদীদের বিরুদ্ধে 'হলোকস্টে'র, মানবতা ধ্বংসের কারবার হয়েছিল হিটলার - হিমলার- গোয়েবলস্- গোয়েরিং প্রমুখর নির্দেশে। এখন ভারতেও একই ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ড চলছে।

ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়িয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের হেয় প্রতিপন্ন করার পথে চলতে চলতে সংঘ পরিবার বা বিজেপি মাত্রাজ্ঞান লুপ্ত হয়ে পড়েছে। শাসক দলের দুই শীর্ষ মুখপাত্র সমস্ত বোধ লুপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রধান ও শেষ পয়গম্বর সম্পর্কে ইতর মন্তব্য করে বসেছে। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি কতটা আর বরদাস্ত করবে! তারা অবশ্যই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। প্রমাদ গুনেছে ভারতের শাসক দল। তড়িঘড়ি পরিস্থিতি সামলাতে একজন মুখপাত্রকে সাসপেন্ড এবং অন্যজনকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি বিজেপি।

আরব দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ব্যাপক ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকার রপ্তানি ব্যবসা করে ভারতের কর্পোরেটগুলি। ইতোমধ্যেই তাদের পণ্য বয়কট শুরু হয়েছে। সমস্ত ভারতীয় পণ্য আরব দেশগুলিতে কেনা বেচা বন্ধ। মাথায় হাত পড়তে চলেছে আদানি-আম্বানিদের। মোদি এখনও চুপ করেই আছেন। মৌন প্রধানমন্ত্রী দিশাহীন হয়ে পড়েছেন। শুধুমাত্র রপ্তানি ব্যবসাই নয়; ভারতের প্রায় ৮৯.৮ লক্ষ মানে, প্রায় এক কোটি মানুষ মধ্যপ্রাচ্য এবং আরব দেশগুলিতে জীবিকা অর্জন করেন। তারা ভারতের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাও পাঠান। দেশের Balance of payment-এ এইসব শ্রমিক কর্মচারীর অবদান অনস্বীকার্য। এমন সব কর্মচারীদের বৃহদংশ ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান নন। এই বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষদের নিরাপত্তা যদি এখনও বিঘ্নিত হয় তাহলে, কোনও শর্মা বা জিন্দাল কি দায় নেবেন? মোদি সম্ভবত বুঝে শুনেও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন! ভারত সরকারের অবশ্যই অনতিবিলম্বে ওইসব মুখপাত্রদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পরিস্থিতির অবনতি হবার দুর্ভাবনা অবশ্যই আছে। মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে যে গভীর অপরাধ বিজেপি করেছে তার ফলাফল যে কী হবে তা এক্ষুনি নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। দীর্ঘকাল যাবৎ অপকর্ম করার বদ অভ্যাসই কাল হয়েছে মোদি সরকারের।

স্বয়ং পয়গম্বর সম্পর্কে হীন মন্তব্য করার ফলে ভারতে বসবাসকারী বহু মানুষের মধ্যে সঙ্গত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশে এবং অন্যত্র উত্তেজিত মানুষ পথে নেমে তীব্র প্রতিবাদে সামিল। ওই রাজ্যের যোগী সরকার সুযোগ পেয়েছে ধর্মীয় বিভাজনকে আরও স্পষ্টতর করার। এই সরকার গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত হলেও যোগী আদৌ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশ্বাসী নন। বুলডোজার ব্যবহার করে যত্রতত্র প্রতিবাদীদের বাসস্থান গুঁড়িয়ে দেবার চরম অনৈতিক কাজে যোগী প্রশাসন মত্ত হয়ে উঠেছে। এলাহাবাদ সাহারানপুর, কানপুর প্রভৃতি শহরে বহু বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে বুলডোজার অভিযান। এদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশের ন্যূনতম আবহও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আবার পশ্চিমবঙ্গে অজস্র কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই সুযোগে একাংশ মুসলমানদের উত্তেজিত করে ঘোলা জলে মাছ ধরতে ব্যস্ত। শিক্ষা দপ্তরের চরম দুর্নীতি, কয়লা, গরু, বালি, পাথর প্রভৃতি পাচারের বিশাল আয়োজন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিপদে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে এখন প্রতিদিন সিবিআই তদন্তের মুখে পড়তে হচ্ছে। কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত চলছে। মোদি, অমিত শাহ কিংবা রাজনাথ সিংকে ম্যানেজ করেও বাঁচা যাবে না। সুতরাং, হাতে পাওয়া সাম্প্রদায়িক তাস খেলে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেবার প্রকৃষ্ট সুযোগ তৃণমূল কংগ্রেস হাতছাড়া করতে চাইছে না। তাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় পশ্চিমবঙ্গে এক ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। পুনর্বার রাজ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ বিজেপিকে আবার প্রাসঙ্গিক করে তুলে 'বাইনারি' আবার সামনে নিয়ে আসা যাবে। বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক করতেও কাজে লাগবে।

এই রাজ্যের দীর্ঘকালের সংস্কৃতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ২০১৭ সালে শাসকদলের প্রত্যক্ষ প্ররোচনাতেই বসিরহাট অঞ্চলে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল। তদন্ত করার জন্য একটি কমিশনও হয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও কেউ জানেন না সেই কমিশন কী করেছে! তৃণমূলী অপশাসনে সবই সম্ভব!

এসবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে বামপন্থীদেরই অগ্রসর হতে হবে। রাজ্য এবং দেশের মানুষকে বাঁচানোর দায়বদ্ধতা বামপন্থীদেরই আছে। এই সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না।

পি এস ইউ'র রাজ্য কাউন্সিল অধিবেশন

কলকাতার লোকায়ত সভা গৃহ বা ক্রান্তি প্রেস-এ অনুষ্ঠিত হলো পি এস ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিল অধিবেশন।

১২ জুন সকাল থেকে শুরু হয় কাউন্সিল। প্রতি জেলা থেকে রাজ্য কাউন্সিল সদস্যদের নিয়ে প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন পি এস ইউ-এর প্রাক্তন নেতা ও আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা এবং আগামী দিনে ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র করার স্বার্থে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। এরপর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা সংগঠনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং সেই প্রতিবেদন-এর উপরে আলোচনা করেন সমবেত প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধিদের আলোচনা থেকে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে, আনিস খানের খুনীদের যথাযোগ্য শাস্তির দাবিতে, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রাক্তন পি এস ইউ রাজ্য সভাপতি কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করে বলেন, বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত সরকার ডিজিটাল শিক্ষার নামে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে তার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র আন্দোলনের নেতা বর্তমানে পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. দেবাশীষ মুখার্জি ও প্রাক্তন ছাত্র আন্দোলনের নেতা, ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কম. দীপক সাহা। পি এস ইউ রাজ্য বর্তমান রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কারণে এই কাউন্সিল অধিবেশনে পি এস ইউ-এর নতুন রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন কম. কৌশিক ভৌমিক ও সভাপতি নির্বাচিত হন কম. হাবিবুর রহমান সোহেল।

কাউন্সিল অধিবেশন শেষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে ও এস এস সি, টেট দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পি এস ইউ মৌলালি মোড়ে মিছিল সহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মিছিল শেষে সাধারণ সম্পাদক কম. সাফিউল্লা বলেন, ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষান্তে কাজের অধিকারকে ভুলিয়ে দিতে সরকার পরিকল্পিত ধর্মীয় বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করেছে। দেশের সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে যেভাবে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটছে তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর সবিশেষ জোর দেন কম. সাফিউল্লা।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস

অমিতাভ চক্রবর্তী

২৬ জুন বিজেপির অন্যতম শীর্ষ মুখপাত্র নূপুর শর্মার পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কুৎসিত মন্তব্য নিয়ে দেশ জুড়ে সোচ্চার প্রতিবাদ উঠেছে। শুধুমাত্র মুসলমান সমাজই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এমনটা নয়। সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। এই ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য। জাতীয় আন্তর্জাতিক চাপে নূপুর শর্মাকে ইতিমধ্যে বিজেপি দল ছ'বছরের জন্য প্রাথমিক সদস্যপদ বাতিল করে দায় সারার চেষ্টা করেছে। এর পূর্বেও বহুবার বহু বিজেপির বহু নেতা ভিন্ন সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন সময় কুৎসিত ও বর্বরোচিত মন্তব্য করেছেন। মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর 'গুলি মারো শালো কো'-র মতো কুরুচিকর মন্তব্য করার পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়াই হয়নি। দলের অনেক নেতাই মুসলমানদের লাথি মেরে দেশ থেকে বার করে দেবার কথা বলেছেন—বিষয়টা এমন যে, দেশটা তাদের বাপের জমিদারি; যাকে খুশি রাখবেন, যাকে খুশি তাড়াবেন। এই ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বর আচরণ কী অচিন্তিত? মোটেই নয়। নূপুর শর্মার বক্তব্য কোনো আলটপকা মন্তব্য নয়—অত্যন্ত সুচতুর একটি প্রয়াস। এই মন্তব্যটি তিনি করছেন কখন? কোন সময়? যখন রান্নার গ্যাসের দাম হাজার টাকা ছাড়িয়েছে। পেট্রোলের দাম ১১০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯৩ টাকা ছুঁয়েছে। মে মাসে দ্রব্যমূল্যের পাইকারী সূচক ১৫.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত এক মাসে বৃদ্ধির হার ১ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবর্ষকে মুদ্রাস্ফীতির ভিত্তিবর্ষ ধরলে বৃদ্ধির হার ১৪৫.৩ শতাংশ, যা বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

মোদি সরকারের বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দুরাশায় পরিণত হয়েছে। বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়ে মে মাসে দাঁড়িয়েছে ৭.৮৩ শতাংশ। গত মার্চ মাসে এই হার ছিল ৭.৬ শতাংশ—যা বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার ৮.৬৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮.৫ শতাংশ যা বিগত ৭ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর সরল অর্থ করলে দাঁড়ায় আমরা রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো ৫০ বছর পিছনে চলে গিয়েছি।

অপর দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লগ্নি পুঁজির সংকটকে দূরীকৃত করণের অক্ষম প্রয়াস হিসেবে রেপোরেটে ৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য কোনো বিশেষ পাণ্ডিত্যের দরকার নেই। এসবের ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিক্রি আরও সঙ্কুচিত হয়েছে। শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রগুলি উৎপাদনকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছে— যার স্বাভাবিক পরিণতি আরও কর্মহীনতা।

অনেক আগেই ক্ষুধাসূচকে ভারতের স্থান ১৩৫টি দেশের মধ্যে ১১৬তম স্থান নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, যা বাংলাদেশ, পাকিস্থান ও নেপালের অনেক পিছনে। অতীতের কলকাতার বাবুরা নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য (বাইজি বাড়ি গমন, ভুবনচন্দ্রের ভাষায় অগম্যাগমন, মদ্যপান, পায়রা বা বানরের বিয়ে, পিতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি) জমিদারির অংশ বিক্রি করতে কুণ্ঠিত হতেন না। একই মানসিকতায় কেন্দ্রীয় সরকার জীবন বিমা নিগম সহ লাভজনক সংস্থাগুলিকে বহুজাতিক লগ্নিপুঁজির হাতে তুলে দিয়ে কবি বর্ণিত 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে তুলে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত।

প্রসঙ্গত বিগত শতকের তিরিশের দশকে মহামন্দার বিপর্যয় দেখে শঙ্কিত ম্যানিয়ার্ড কেইনস ১৯৩৩ সালে দি ইয়েল রিভিউ পত্রিকার একটি নিবন্ধে লেখেন, 'লগ্নিকে শেষ পর্যন্ত জাতীয় চরিত্রের হতেই হবে'। কিন্তু মহাভারতের অমোঘ উক্তি 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি'র বিভিন্ন দেশের চরম দক্ষিণপন্থী শাসকদের মতো, মোদি ও নির্মলাজী কেইনসের হুঁশিয়ারির-ও তোয়াক্কা করছেন না। উদ্ভূত সঙ্কট থেকে শোষিত নিষ্পেষিত মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম সংঘটিত করতে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে নূপুর শর্মার এই সুচতুর প্রয়াসের পিছনে আশ্চর্যের কিছু দেখি না।

রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তদর্শী ছিলেন। সে কারণে ১৪ ভাদ্র ১৩৩০ বিজলীতে এক নিবন্ধে লিখেছিলেন 'ক্ষুধা মুসলমানকে কাতর করে; প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দু'সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। ধর্ম-বর্ণভেদে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।' ঐতিহ্য ও পরম্পরার থেকে শ্রেণি সংগ্রামকে বিযুক্ত করতে রবীন্দ্রনাথও চান নি। 'যারা জিতছে, যারা লুটছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে। আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে' (বাতায়নিকের পত্র, কালান্তর)। মেহনতীদের ঐতিহ্যের পরম্পরা তাদের যাপন পদ্ধতির মধ্যে নিহিত থাকে শ্রম নিয়োজনের কাহিনী, আত্মজকে বাঁচিয়ে রাখার জীবনপণ সংগ্রাম। শ্রমে নিযুক্ত বাহিনীর থেকে যখন শ্রমের মজুত বাহিনীর সংখ্যা বেশি হয় তখন অর্থনীতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে বাধ্য। ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক শাহ ওয়ালিউল্লাহর মনে হয়েছিল, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কৃষকদের বিদ্রোহ ব্যতীত অন্য পথ খোলা থাকে না—মার্কসীয় এই দ্বান্দ্বিক নিয়মকে উপেক্ষা করা অনুচিত হবে। কৃষকদের সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিজয়ের পরেও মৌলিক দাবিগুলি এখনও অধরা রয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কৃষকরা ফুঁসছে পরবর্তী সংগ্রামের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের শোরগোলের মধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ অতীতের অন্যান্য স্বৈরশাসকদের মতো ঘোষণা করেন, তাঁরা তাদের মতো করে ইতিহাস রচনা করবেন—যা একটি মূঢ় প্রয়াস ব্যতীত ভিন্ন কিছু নয়। সংকটে দিশাহারা ফ্যাসিস্ত শাসকদের ভিন্ন পর্যবেক্ষণ ঐতিহাসিক ভাবে সম্ভব হয় না। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করা ব্যতীত অন্য কোনো পথ অত্যাচারী শাসকদের কাছে অতীতেও ছিল না, এখনও নেই।

সমস্ত ধর্মের মধ্যেই হয়তো ভাল নির্দেশ আছে, মৌলবাদীরা সেগুলিকে উপেক্ষা করে—বিপরীতে উদার মুক্তমনা মানুষরা সেগুলিকে গ্রহণ করে জনমনে সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেন। ইসলামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি। আকর শব্দ সালাম থেকে ইসলামের উৎপত্তি। এঙ্গেলস খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি নিবন্ধ লেখার অনুভব করেছিলেন, সাম্যের ধারণা থেকেই ইসলামের উদ্ভব ঘটেছিল। উপনিষদের 'বহুজন সুখায়' বহুজন হিতায় চ' শব্দবন্ধকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যুগ যুগ ধরে উপেক্ষাই করেনি, অন্ত্যজ মানুষদের ঘৃণার মধ্য দিয়ে নির্মম শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ রেখেছে। যুগ যুগ ধরে এই মোহান্ধরা শুধু মেরেছে আর মরেছে। হিন্দুত্ববাদীরা শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মের মানুষদের উপর আক্রমণ করে না, দলিত আদিবাসীদের উপর যুগ-যুগান্ত ধরে চলে আসা শোষণের নিগড়কে আরও শক্ত করতে চায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র 'ডগমা' হিসেবে ধরা উচিত হবে না। এটি আদিম সামন্ত শোষণের একাদিক্রম বলে গণ্য করতে হবে।

(২)

গতানুগতিকভাবে বাংলার সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও পরম্পরার দাবি করার সময় ভুলে যাই, এগুলি সাজিয়ে রাখার জিনিস নয়। শ্রীচৈতন্য লালন শাহ অথবা রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বাংলা শুধু কথার কথা নয়। তাঁদের চিন্তা ভাবনা রুদ্ধ হলে বিপরীত ক্রিয়াগুলি শক্তিশালী হতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে সাম্প্রতিক অতীতে বাংলার ঐতিহ্যর বিপ্রতীপে আসানসোল, বসিরহাট, হাজিনগর, নৈহাটি, কাকিনাড়া ও তেলিনিপাড়ায় দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। ২৬ জুন নূপুর শর্মার কুৎসিত মন্তব্যের পর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু ৮ জুলাই ডোমজুরের অঙ্কুরহাটির ঘটনা আমাদের আতঙ্কিত না করে পারে নি। ৮ জুলাই থেকে ঘটনা হিংসাত্মক রূপ ধারণ করার কারণ অনুসন্ধান একান্ত জরুরি। হঠাৎ করে ইউক্রেনের লড়াই উলুবেড়িয়ায় এসে উপস্থিত হবার কারণ অনুসন্ধান এই নিবন্ধের দ্বিতীয় চক্রান্তের সুলুক সন্ধান।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্ট সংকটগুলিকে রাজ্য সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না, বরং আর্থিক ক্ষমতা কম হওয়ার ফলে রাজ্যগুলির সংকট আরও তীব্র। দ্বিতীয়ত নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের পরে রাজ্য সরকার ও শাসকদল তৃণমূলের মধ্যেকার স্ব-বিরোধগুলি আরও তীব্রভাবে প্রকটিত হয়েছে। নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির ভারসাম্য রক্ষার জন্য অর্জুন সিং বা বাবুল সুপ্রিয়র মতো দাঙ্গায় প্রচ্ছন্ন মদত দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্তদের দলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তৃতীয়ত রাজ্য সরকার চটুল জনমোহিনী ডোল দেবার নীতিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার ফলে বিপুল ফিসক্যাল ঘাটতির আর্থিক অনাসৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের অবিবেচক আর্থিক নীতির পিছনের কাজ করে এক ধরনের নৈরাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ভাবনা।

অনেকেই এমনটা আশঙ্কা করছেন, অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হয়ে পড়তে পারে—তাদের আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। একথা ঠিক ভারতের মতো গরিব দেশে প্রান্তিক মানুষদের রিলিফ কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবিবেচক সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু দুর্গাপূজা কমিটিগুলিকে বেপরোয়া অর্থ সাহায্যর মতো কর্মকাণ্ডের কার্যক্রমকে নৈরাজ্যবাদী অর্থনৈতিক প্রকল্প বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অপরদিকে কৃষকদের উপর সরকারের উদাসীনতা, স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ফড়ে ও মজুতদারদের যোগাযোগের ফলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না পেয়ে কৃষকরা আরও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে—অভাব ও দেনার দায়ে আত্মহননের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

দেশের খোলা বাজারে সাধারণ চাল ৪০ টাকার নিচে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এ রাজ্যের কৃষকরা ১৪০০-১৬০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এরাজ্যে আলু সহ অন্যান্য সবজি চাষ করে কৃষকদের উদ্বৃত্তর মুখ দেখা দূর অস্ত, বরং প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একথা বুঝতে কোনো পাণ্ডিত্যের দরকার নেই। কৃষিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি না হলে বাজার সম্প্রসারিত হওয়া সম্ভব নয়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষক সংগ্রামের পীঠস্থান এই রাজ্যে বিকল্প আন্দোলন গড়ে তোলার দুর্বলতার জন্য কৃষকরা আরও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে।

চতুর্থত, নিয়োগহীনতার কারণেও এরাজ্যের বাজার ব্যবস্থা সংকুচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অন্যতম বড় নিয়োগকারী ইনফোসিস কর্তা মোহনদাস পাই এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা আজ বাংলা ছাড়া হয়েছে। এই নৈরাজ্যকর অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভব হয়েছে কাটমানি ও লুঠপাটের মধ্য দিয়ে টিকে থাকার তত্ত্ব। যার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বগটুই গ্রামের ঘটনা। রাজনীতির নৈরাজ্যজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে সব যুগে, সব কালেই সমাজবিরোধীরা দলের নিয়ন্ত্রণের আসন দখল করে, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। রাজনীতির মূল্যবোধগুলিগুলির প্রতিসরণ ঘটলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হয়। পঞ্চমত, আর্থিক স্থিতির স্বরূপ বোঝা যায়, রাজ্য সরকারকে শুধুমাত্র মদ ও পেট্রোলজাত পণ্য বিক্রির করের উপর নির্ভর করে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দায় অস্বীকার করা অনুচিত হবে। দুর্নীতি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ার কারণে জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া এবং বিচার ব্যবস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্দেশের ফলে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল এখন দিশাহারা। এই অবস্থায় জনমানসে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানোর জন্য তাদের দরকার ছিল নূপুর শর্মার মতোই বিপরীত মৌলবাদী কার্যক্রম গ্রহণে প্রচ্ছন্ন সায় দেওয়া।

প্রশাসনের মদত না থাকলে হাওড়া থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত টানা চারদিন অবরোধ, ভাঙ্গচুড় বা আগুন লাগানো সম্ভব হতো না। মনে রাখতে হবে, জনপদে আগুন লাগলে দেবালয়ও রেহাই পায় না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা করলে পুলিশ তাদের জেলে ঢোকায়। আর নূপুর শর্মার নামে কয়েকশো অভিযোগ দায়ের হলেও সরকারের কোনো হেলদোল দেখা যায় নি।

আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে মৌলবাদীদের কোনো জাত ধর্ম হয় না। তারা সর্বসময়ে সাধারণ গরিব খেটেখাওয়া মানুষের স্বার্থের বিপ্রতীপে অবস্থান করে। আরও মনে রাখতে হবে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষিণপন্থী বিকল্পের অবস্থানের মতো ঐতিহাসিক ভুল আর কিছু হতে পারে না। অত্যন্ত পরিতাপের হলেও সত্য, এখনও বেশ কিছু তথাকথিত বামপন্থী যারা দক্ষিণপন্থাকে বিকল্প হিসেবে তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে—এরা সংশোধনাতীত। সরকারের জনবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস এই রাজপ্রসাদপুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা পাবে কোথা থেকে? অনেক দেরিতে হলেও, যে সময় বামপন্থীরা খোলস ছেড়ে নিজেদের ভাবমূর্তি ফেরানোর জন্য রাস্তার আন্দোলনে সামিল হতে শুরু করেছে; সেই সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য তৃণমূল সরকারের দরকার বাহিনারি বা দ্বিচল বিশিষ্ট রাজনীতির পথে প্রত্যাবর্তন। এই দুটি ভাইকে ডুগডুগি বাজাতে হলে বামপন্থীদের গয়া-কাশি পাঠানো এবং এই সংকটময় অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য দরকার মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো। দুর্বল চেতনার আভাসে লুকিয়ে থাকা জান্তব সাম্প্রদায়িক বোধগুলিকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলা। সে কারণেই 'ভগবান নিদ্রা দিয়েছেন' এই ভনিতা করে ৯৬ ঘণ্টা নীরব থেকে একটি আতঙ্ক ও নৈরাজ্যের অবস্থাকে কুলোর বাতাস দিয়ে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে—এছাড়া দুই সরকারের আর কীই বা করার ছিল? কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এখন বলতেই হচ্ছে: ....রঙ্গিলা রঙ্গিলা/কী খেলা খেলিস তুই।

অগ্নিপথ : কর্মসংস্থানের নামে চরম প্রতারণা

মাত্র চারটি বছর সাময়িকভাবে চুক্তির ভিত্তিতে সৈনিকের চাকরি 'অগ্নিপথ' নিয়ে শুধু মাত্র যুবসমাজের মধ্যে নয়, সমাজতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মী সহ নাগরিক সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন জেগে উঠেছে। অবিলম্বে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই দেশজুড়ে বিক্ষোভের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এই ধরনের প্রকল্প কার উর্বর মস্তিস্কে জন্ম নিল; নোটবন্দি, জি এস টি'র রূপকারদের দঙ্গলের দিকেই সবাই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। কারণ এই সব হিন্দুত্ববাদী গোড়া উগ্র রাজনীতিবিদদের দঙ্গলই শেষপর্যন্ত পাকিস্তানে দুঃসাহসী হানার গল্প ছড়ায়। অথচ চিনের ভারতভূমি দখল করে রাখার কাহিনীগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে চায়। অথবা আট কোটি না দশ কোটি স্থায়ী চাকরির বদলে সামরিক বাহিনীতেও মাত্র চার বছরের চুক্তিতে জীবনপ্রাণ পণ করে যারা বছরের পর বছর চাকরির জন্য হাপিত্যেশ করে বসে আছে, তাদের চরম বিপজ্জনক এবং অস্থায়ী কাজের ঝুঁকির আগুনে নিক্ষেপ করতে চায়। নামটাও তাই জব্বর রেখেছে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার পথ। ক্ষীণপ্রাণ পতঙ্গের মত?

আসলে সামরিক বাহিনী, যুদ্ধসম্ভার, প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সঙ্গে একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ কখনো সীমান্ত সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘিরে একটা 'ছদ্ম দেশপ্রেমের' জিগির তোলার সুযোগ সর্বদাই শাসক শ্রেণির কাছে থাকে। আর সংঘ পরিবারচালিত বিজেপির কাছে সেটা তো একটা বড় পুঁজি। অন্য বিষয়ও আছে। সেটা যুদ্ধ নির্ভর অর্থনীতি। এই অর্থনীতি সর্বদাই আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। আর রাস্তাঘাট, দুর্গম অঞ্চলে যানবাহন ও তাদের চলাচলের সেতু সুড়ঙ্গ ইত্যাদি ঘিরে যে অর্থনীতি, তার সিংহভাগটাই এখন হস্তগত হচ্ছে কর্পোরেটদের হাতে। সুতরাং বিজেপির মতো দলের কাছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক আবহ ঘিরে অজস্র মিথ্যা ও রাষ্ট্রিক ভয়সন্ত্রাসের মাধ্যমে একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে সমর্থন জোগাড় করা নির্বাচনী যুদ্ধ একটি স্থায়ী প্রকল্প। পাশাপাশি আগ্রাসী অর্থনীতিতে ক্রমাগত বেসরকারিকরণ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন অনৈতিক পথে দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের সেবা করার জায়গাটাও প্রভাবিত করার সুযোগ থাকে। ইত্যাদি এরকম অজস্র উদাহরণ রয়েছে। ভোটের দামামা বাজলেই যার অনেকগুলি শুশুকের মতো নদীর জলে ভেসে ওঠে।

যাক সে সব কথা। এই ব্যবস্থাটা মসৃণভাবে চালাতে গেলেও সমস্যা কম থাকে না। বহুদিন ধরেই সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগেই বহু সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের কথা চলছে। এত মৌলিক এবং সমস্যা সঙ্কুল যে 'দড়ি ধরে মারো টান' বলার হিম্মত কারোরই হচ্ছে না। কি প্রয়োজন, কেন প্রয়োজন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বা সমীক্ষাও হচ্ছে না। তাই একটা 'স্ট্যাটাস কো' বা যেমন আছে, তাই থাকুক একটু একটু পালিশ করে দেওয়া যাক। এরকম একটা রাস্তা বা কৌশলই হল মোদী- অমিত রাজনাথদের 'অগ্নিপথ'। একটু তলিয়ে ভাবলে দেখতে পাবো যে দেশের আর্থরাজনীতি যে গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ এই সরকারের জানা নেই। যেমন সেনাবাহিনীর পেনশনের সংস্কারের বিষয়টা। বহুদিন ধরেই বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে। শুধু ভোটের সময় বিজেপি ওটাকে বাক্স থেকে বের করে জনসমক্ষে সাজিয়ে রাখে। ও আর ও পি (একপদ, এক পেনশন) সংস্কার করতে গেলে সরকারের কোষাগারে ঠনঠন আওয়াজ হবে শুধু। বুঝেও বুঝছে না, ক্রমাগত জনপ্রিয়তাবাদের একটা সীমা আছে। যেটা লঙ্ঘন করলেই বুমেরাং-এর মতো ফিরে এসে জনপ্রিয়তাবাদকেই আঘাত করে। স্থায়ী চাকরি ও পেনশন প্রাপকদের কিছু সুবিধা না দিলে চলে না—তাই অনেক কম মজুরিতে, অনেক কম সময়ের জন্য অস্থায়ী চাকরির ঝুঁকি নিতে বাধ্য করা হচ্ছে 'অগ্নিপথে'র পথ বেয়ে ছুটে আসা যুবক যুবতীদের। আসলে তাদের বলির পাঠা করা হচ্ছে। চরম হতাশা, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, ঝুঁকি ও দায়বদ্ধতা নিয়ে দ্বিধা-সর্বোপরি চার বছর পরের অনিশ্চয়তার চিন্তা নিয়েই বেকারত্বের অন্ধকার গহ্বরের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে মোদি সরকার। যথারীতি সারা দেশের যুব সমাজের মধ্য থেকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। বিহার উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ সহ সর্বত্র।

স্মরণে রাখা ভাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সেনাবাহিনী ইরাক, আফগানিস্তান বা অন্যত্র দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছে, তারা অনেকেই বেসরকারি অস্ত্র প্রস্তুতকারক বহুজাতিক কর্পোরেশনের ঠিকা শ্রমিক। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ব অস্ত্রপ্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলির দ্রুত বেসরকারিকরণ চলছে। এখন সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশকেও বেসরকারি ব্যবসায়ীদের জিম্মায় দিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সে পথ সুগম করার জন্য মোদি সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে।

নদীয়া জেলায় ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সমিতির সম্মেলন

প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত তেহট্ট মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার মোহরার সমিতির সম্মেলন ১৩ জুন ২০২২ মহিষবাথানে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তেহট্ট মহকুমার চারটি ব্লক থেকে শতাধিক মোহরার অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে মোহরারদের সরকারী কর্মচারীর স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদানের দাবি জানানো হয় ও মোহরাদের কাজ বন্ধ করে দেবার জন্য যে চক্রান্ত চলছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কম. সুবীর ভৌমিক, কম. শিশির দত্ত, কম. বিধান মন্ডল, কম. সুভাষ বিশ্বাস, কম. সুশীল মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইউ টি ইউ সি নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কম. সুবীর ভৌমিক তাঁর ভাষণে বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংস সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার শ্রমজীবী মানুষের ওপর নির্বিচারে যে আঘাত হেনে চলেছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই তার নিরসন ঘটাতে হবে।

সম্মেলন শেষে একটি সুসজ্জিত মিছিল মহিষবাথান বাজার পরিক্রমা করে। এই মিছিল এলাকায় বিপুল সাড়া ফেলে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কম. সাক্ষী পাল।

কম. রুহিনা ঘরামী চলে গেলেন না ফেরার দেশে

পি এস ইউ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সদস্য ও রাজ্য কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য কম. রুহিনা ঘরামী ১৭ জুন চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তার জন্য গত ১২ জুন রাজ্য কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারেন নি। ১৬ জুন ভীষণ অসুস্থ বোধ করলে তাকে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। ১৭ জুন হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই কঠিন সময়ে কম. রুহিনার চলে যাওয়া পি এস ইউ শুধু নয়, জেলার ছাত্র আন্দোলনের এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করল।

কম. রুহিনা ঘরামী লাল সেলাম।

উদয়পুরে কংগ্রেসের দলীয় চিন্তন শিবিরে চিদম্বরমের বিকল্প অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল। সবই বুঝলে কিন্তু বড্ড দেরীতে...

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম দেশের বর্তমান আর্থিক চরম দুর্দশার জন্য কেন্দ্রীয় নীতিকে দুষলেন। বিজেপির নীতি পঙ্গুত্ব নিয়ে প্রচার জনমানসে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি।

প্রসঙ্গত ৯০-র দশকের শুরুতে মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা MNC (মনমোহন, নরসিমহা, চিদাম্বরম) ত্রয়ীর অন্যতম চিদাম্বরম এবার দলের পক্ষ থেকে বিকল্প অর্থনীতির দুর্গগঠনের বার্তা দিলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বিশ্বের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই বিকল্প অর্থনীতির প্রয়োজন বলে দাবি করলেন চিদম্বরম, এই চিন্তন শিবিরে চিদম্বরমের অর্থনীতির বার্তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা এখন চরমে। চিদম্বরমের কথায়, জিএসটি ক্ষতিপূরণের পুরো টাকা না দিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাই দাবি উঠেছে জি এস টি কাউন্সিল ভাঙা চলবে না, আরো তিন বছর রাজ্যগুলিকে জি এস টি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একই সঙ্গে দেশে মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি দিশাহীন এবং নীতি পঙ্গুত্বে ভুগছে এমন কথাই বললেন চিদাম্বরম।

মুখ্যমন্ত্রীকে ইউ টি ইউ সি'র চিঠি

রাজ্য সরকার নিযুক্ত অসংগঠিত কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ। ইতোমধ্যে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের আঞ্চলিক কমিটির সভায় (গত ১৫ জুন অনুষ্ঠিত) সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রীন পুলিশ, বন সহায়ক, প্যারা টিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির ক্যাজুয়াল কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন অশোক ঘোষ. রাজ্য সরকারের মুখ্য শ্রম সচিব প্রভিডেন্ট ফান্ডের আঞ্চলিক কমিটিরও সভাপতি। এই প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠানোর অনুরোধ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই বিহার সরকার সিভিক ভলান্টিয়ার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের 'কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডে'র অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি, ও বিভিন্ন অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন মাত্র ৮ থেকে ১২ হাজার টাকার মধ্যে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ইউ টি ইউ সি'র পক্ষে অনুরোধ জানানো হয়েছে সরকারের ক্যাজুয়াল কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার ছাতার তলায় নথিভুক্ত করা হোক।

বালিখাদান—হাতে রইল পেনসিল

যশোধরা রায়চৌধুরী

রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গিয়েছে। সেই ঝড়ে সেক্রেটারিয়েটের সামনের বিশাল জামগাছটা উপড়ে পড়ে গিয়েছে। ভোরে মালি দেখতে পেল সেই গাছের নীচে একজন চাপা পড়ে রয়েছে। ছুটতে ছুটতে মালি গেল চাপরাশির কাছে, চাপরাশি ছুটতে ছুটতে গেল ক্লার্কের কাছে, ক্লার্ক গেলেন সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে।

কৃষণ চন্দরের গল্প জামুন কা পেড। বিখ্যাত গল্প। ঘটনাক্রমের শেষ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে সুকুমার রায়ের মতো বলতে হয় তার পর কী হইল জানে শ্যামলাল। প্রতিদিন সরকারি দপ্তরে দপ্তরে এমন কত ছোট ছোট ঘটনাই তো ঘটে। ফাইল চলে এ সাহেব থেকে ও সাহেবের দপ্তরে... হিল্লে হয় না, সুরাহা হয় না। জামুন কা পেড় সম্প্রতি আবার আমাদের নজরে এসেছিল কারণ এটি ছিল ইশকুলের সিলেবাসে। দিল্লির কোনো এক বোর্ডের হিন্দি পাঠ্যপুস্তকে। সম্প্রতি গল্পটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে সিলেবাস থেকে। এসব প্রাচীন সরকারি চালাচালি ঠেলাঠেলির গল্প এযুগের জেট সেট শিশুরা কেনই বা পড়বে?

বলি অন্য এক জামুন কা পেড়ের গল্প। বালিখাদান ও খনিজ পদার্থ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা.... প্রায় রহস্য গল্প। তিন ধাপে ঠেলাঠেলি আর চাপান উতোরের গল্প।

ধাপ এক। নাটকটা অভিনীত হয় ভিনদেশে। বোর্নিওর জঙ্গলে আত্মহত্যা!!! রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস যেন। মাইকেল ডি গুজম্যান। ফিলিপিনো। ক্যানাডিয়ান খনিজ অনুসন্ধান কোম্পানি রেক্স-ট-এর কর্মী। স্ত্রীকে ফোন করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিখোঁজ। দুশো পঁয়ষট্টি মিটার উচ্চতা থেকে পতনে মৃত্যু। হেলিকপ্টারে জঙ্গলের ভেতরে সোনা খুঁজছিল তাঁর কোম্পানি।

মৃত্যুর পর জানা যায় ৪১ বছর বয়সী মাইকেলের একাধিক স্ত্রী ও পরিবার ছিলেন একাধিক শহরে। প্রায় ওয়েব সিরিজের মতো গল্প আর কি। পুলিশ জানায় আত্মহত্যা করেছেন মাইকেল। তাঁর চিঠি দেখানো হয় প্রমাণ হিসেবে।

ক্রমশ অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পর জানা গেল, এর পেছনে আছে বিশাল এক স্ক্যান্ডাল। স্বর্ণখনির স্ক্যান্ডালের। এই তো সেদিন ঘটে যাওয়া ঘটনা, ২০২০তে। নকল রিপোর্ট দেখিয়ে, জমির তলায় সোনা আছে বলে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা, জিওলজিস্ট থেকে সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়া ও বড় বড় অফিস স্পেস দখল করা এবং একদিন সব আমানতকারীর লগ্নির টাকা নিয়ে ভোঁ ভোঁ হয়ে যাওয়া। এই হল এই সোনার খনির গল্পটির মূল কাঠামো।

তার আগে পরে, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে নানা রকমের মাইনিং স্ক্যাম বা খনি কেলেংকারির গল্প গজিয়ে উঠেছে। আফ্রিকা বা এশিয়া মহাদেশের যে কোনো তৃতীয় বিশ্বীয় দেশের গল্প একই। মাটির তলায় গিসগিস করা দামি খনিজপদার্থের বিষয়আশয় নিয়ে এরা বসে আছে। আর তাবৎ মাল্টিন্যাশনাল মাইনিং কর্পোরেটগুলো এদের পাখির চোখ করেছে। পেছনে আছে নানা লগ্নিকারী সংস্থা ও দেশ। কেননা খনিজ নিষ্কাষণ এক পুঁজিনির্ভর ক্রিয়া।

প্রথমটি না-থাকা খনিজের গল্প। তেমনই, বাতাসে উড়ছে গল্প। ছোট ছোট গরিব রাষ্ট্রগুলোর ক্ষীণজীবী সরকার ও ক্ষণজন্মা প্রেসিডেন্ট-মন্ত্রীদের চোখে ধুলো দিয়ে, সামান্যতম রয়্যালটি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টন দামি আকরিক তুলে নেওয়ার গল্প। ফলত, মস্ত মস্ত সব আন্তর্জাতিক ''নিয়ন্ত্রক'' সংস্থার নাওয়া খাওয়া ঘুম উড়ে গেছে মাইনিং নিয়ে... বে আইনি খাদান, পরিবেশের ক্ষতি করা খাদান, অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত ভাবে খনিজ পদার্থ তুলে নেওয়া কোম্পানিদের কীর্তিতে প্রতিদিন একটু একটু করে হারিয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক সম্পদের বিলিবন্টন বিপুল অপচয় ও তা ঘিরে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা... আন্তর্জাতিক বা এম এন সি গুলোকে এলাকা লিজ দিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া রাষ্ট্র। এই দিনে ডাকাতি করা মাইনিং কর্পোরেশনের হাত থেকে রাষ্ট্রদের বাঁচাতে পরিকল্পনার কোনো শেষ নেই। শেষ নেই নানা নিয়ন্ত্রক আইন প্রণয়নের চেষ্টার। শেষ নেই স্বচ্ছতা আনার জন্য ডিজিটাইডড মাধ্যমে প্রতি টন আকরিকের সঙ্গে তা থেকে প্রাপ্য রয়্যাল্টি, অন্যান্য কর, ফি ইত্যাদিকে যুক্ত কর, পর্যবেক্ষণের আতশকাচের তলায় আনার প্রচেষ্টারও।

ফলত মাইনিং বা খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এখন হট টপিক। এইখান থেকেই উৎপত্তি হয়েছে বিশ্বজোড়া এক সচেতনতার। যার নাম, ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যাকাউন্টিং। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিগণনা।

এর প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম বলা হয়েছিল ১৯৭০ সালে। সেবার প্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনতির গূঢ় সম্পর্ক নিয়ে জাতিসংঘের সম্মেলনে আলোচনা হয়। তারপর ১৯৮৭ তে ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন পরিবেশের সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলে। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেইরোর আর্থ সামিট-এ পরিবেশগত পরিগণনার (এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকাউন্টিং -এর) কথা প্রথম তোলা হয়। জাতিসংঘ এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মান বা স্ট্যান্ডার্ড বের করে ১৯৯৩ সালে। এর নাম, 'জাতীয় হিসাবের সংকলন'। ২০০৯ সালে এই ফরম্যাট সংশোধিত হয়। ২০১২-তে গৃহীত হয় SEEA -সেন্ট্রাল ফ্রেমওয়ার্ক।

এতটা কচকচির পুনরাবৃত্তির একটাই কারণ, এটুকু বোঝানো, যে, যে কোনো দেশের পক্ষে জাতীয় স্তরে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিগণনা বা সোজা কথায় ভূগর্ভস্থ সম্পদ এবং খাদান থেকে তোলা সম্পদ কতটা কী আছে তার খতিয়ান নেওয়া খুবই জরুরি। বিশ্বব্যাপী একটা চেষ্টা এখন, প্রতি রাষ্ট্র তৈরি করবে তাদের ''ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ অ্যাসেট''।

প্রতিটি দেশ এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতধরা হয়ে সম্মতি দিয়েছে ১৭টি সাস্টেনেবল গোল-কে মেনে নেবার। তার অন্যতম গোল ধার্য হয়েছে ১২ এবং ১৩... ১২ তে বলেছে 'দায়িত্বপূর্ণ উৎপাদন ও ভোগ প্রতিক্রিয়ার' কথা, যার একটা বড় অংশ হল ২০৩০-এর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী পরিচালনা এবং কার্যকরী ব্যবহারের লক্ষ্য। আর ১৩তে আছে 'পরিবেশ সংরক্ষণের' কথা। এই সব এস ডি জি বা বাংলায় যা দাঁড়ায় 'টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য', এদের নিয়ে ঠান্ডাঘরে বসে নোনতা বিস্কুট আর কফি কাজু সহ মিটিং-এর পর মিটিং, সেমিনারের পর সেমিনার হয়ে চলে, হয়েই চলে। স্লাইডের পর স্লাইড পাওয়ার পয়েন্টে দেখে অনেক কিছু আত্মস্থ করে অফিসাররা, তারপর বেরিয়ে ভুলে যায়।

ধাপ দুই। ভারতে আইনগত যা যা কর্তব্য তাইই করতে চায় না সরকারগুলি। সরকারি নানা ধরনের কাজ আছে। কিছু দ্রুত, কিছু খুব শম্বুকগতিতেই চলছে, এটা কিছু তথ্য হাতে না থাকলেও বলাই যায়! সে তো যে কোনো গণতন্ত্রেই খুবই কঠিন এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ। ভারতের মতো ফেডারাল স্ট্রাকচারে, যেখানে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক আলাদাই স্তরের রাজনীতির জন্ম দেয়, সেখানে তো বটেই।

ভারতে, খাদান কেলেঙ্কারির নানা রূপ ও প্রকার। গোয়া বা কর্ণাটকে বিভিন্ন সময়ে ঘটে গিয়েছে আকরিক লোহা তোলা নিয়ে নয়ছয়। সেসব খবরে পড়েছেন সবাই। আবার জাতীয় স্তরে, ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে ২০১২ সালের বৃহৎ কয়লা কেলেঙ্কারি যা ২০১৪ সালে সরকার উল্টে দিয়েছিল। কয়লা জাতীয় বিষয়, রাজ্যাধীন নয়, কেন্দ্রের অধীন। এইভাবেই চলছিল। ইতিমধ্যে, এসে পড়ল জাতীয় সম্পদ পরিগণনার নতুন প্রকল্প। যেটার আইনি কোনো বিধান নেই, অর্থাৎ চাইলে রাজ্য সরকারগুলি এ কাজটা করতেও পারেন, না-ও পারেন। বাধ্যতামূলক নয়। উপদেশমূলক।

একটি কেন্দ্রীয় দপ্তরের এই দায় এসেছে। তাদের তো বহু শুঁড়, ভারতের সব রাজ্যেই উপস্থিত। পাঞ্জাব থেকে সিকিম, অরুণাচল থেকে তামিলনাড়ু, সব রাজ্য সরকারকেই এখন গিলিয়ে দিতে হবে একটি তিক্ত পিল। জাতীয় সম্পদ পরিগণনা। তার প্রথম লক্ষ্য হল, খাদান সম্পর্কিত তথ্য সংকলন।

ধরা যাক, রাজ্য ক। সেখানে কাজটি এইরকম হল। চিঠি লেখা, উত্তর প্রত্যুত্তর। কেন্দ্র চিঠি দিল রাজ্যের এখন উত্তরে ''না'' বলা নিয়ম। তাই রাজ্যের আধিকারিকেরা জানালেন, এ রাজ্যের মূল খনিজ হল কয়লা, আর কয়লা তো কেন্দ্রের বিষয়। তথ্য সংকলন আমরা কেন করতে যাব।

এই অব্দি ঠিক ছিল। মিটিং-এর পর মিটিং হল এবং সিঙাড়া চা খাওয়া হল। অতঃপর সংস্থাটি দ্বারস্থ হলেন কেন্দ্রীয় সংস্থা কোল ইন্ডিয়ার। কিছু তথ্য পাওয়া গেল। এদিকে রাজ্য সরকারের তো আছে একটি আস্ত মাইনিং ডিরেক্টোরেট। তাঁরা জানালেন, কোল ইন্ডিয়া থেকে আনা তথ্যটা আনুন, তারপর আমরা তার ওপরে ছাপ্পাটা বসিয়ে দেব।

এর পরে জানা গেল, কয়লা বাদে সেই রাজ্যে আরেকটি খাদানজাত বা খনিজ উৎপন্ন হয়। তার নাম বালি। বালির জন্য আলাদা কোনো পর্যাপ্ত ডেটাবেস নেই। রয়ালটির ব্যবস্থা আছে কিন্তু যতক্ষণ না আসলে কত টন বালি উঠল জানা যাচ্ছে, রয়ালটি ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে কিনা জানা যাবে না। না আছে পরিগণনার কোনো মাধ্যম। কে কখন কোথা থেকে বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের জেলায় জেলায় তা হিসেব করার জন্য কেউ বসে নেই। বছরে মোটামুটি এত টন বালি ওঠে, এটা বলার মতো কোনো বিশেষ লোক নেই। নির্ভর করে রাজ্যের অভিনিবেশ আর ইচ্ছের ওপর। সবটাই গোলা অংক। কেউ সত্যিটা জানে না।

অথচ বালি দুই প্রকার। এক, বালি ওঠে নদীখাত থেকে। এর কোনো হিসেব হয়না, কারণ প্রতি বর্ষার পরে বালি জমা হয়ে, শীতে সেই বালি তুলে নেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই পরের শীতে আবার বালি তৈরি হবেই। এই যে, প্রক্রিয়ায় বালি ভরে উঠছে নদীতে। এটা সাস্টেনেবল। কিন্তু এত সহজ নয় অন্য কিছু বালি তোলা, যেখানে পাহাড়ের ঢালে বা সমতলে বালি আছে। তুলে নিলে সে জায়গা আর ভরাট হবে না। ফাঁকা হবে।

এই দুটো ধরনের বালিকেই আলাদা ভাবে হিসেব রাখতে হবে। সম্প্রতি, ২০২০ সালে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ অরণ্য ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রক থেকে ইস্যু করা হয়েছে একটি অতি বিস্তৃত গাইডলাইন। Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining। এই গাইডলাইন কিন্তু পাবলিক ডোমেনে আছে, যে কেউ পড়ে দেখতে পারেন। উপকার হবে। তার আগে ২০১৬তে সাস্টেনেবল স্যান্ড গাইডলাইন আনা হয়েছে। বিশাল বড় কাজ এগুলো, এর পেছনে আছে বেআইনি বালি খাদানের অস্বাভাবিক প্রবণতাকে আটকানোর সাধু উদ্দেশ্য। গোটা ভারতেই যা রমরমিয়ে চলছে, বিপন্ন করছে প্রকৃতিকে, পরিবেশকে।

পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া বালি কেন, কোনো খাদানই শুরু করা সম্ভব না। যাঁরা খনিজ তুলে ব্যবসা করত চান, তাঁদের হাতে রাশ ছেড়ে দিলে, যা হবে তাতে গোটা ভূমি ও পরিবেশ বিপন্নই শুধু হবে না, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিপন্ন হবে। অথচ রিয়াল্টি সেক্টর, বাড়ি তৈরির সেক্টরের প্রবল চাপ—বালি চাই! বালি চাই!

ভাল একটা কাঠামো দরকার। যাতে এই প্রতিটি ধাপ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। কাগজ কলমে রাজ্য ক, আমাদের আলোচ্য রাজ্যটিও সেট আপ করেছে বালির সুনিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ধরনের দপ্তর থেকে শুরু করে, ওয়েব সাইট, অনলাইন তথ্যভাণ্ডারও। এর ফলে, শোনা যাচ্ছে, রাজ্যও প্রাপ্য রাজস্ব পাবে। রয়্যাল্টি মানেই তো রাজস্ব। ডিজিটাইজ করা হচ্ছে, বা একটা পোর্টাল খোলা হচ্ছে, যেখানে প্রতি টন তুলে ফেলা বালির হিসেব থাকবে। স্বচ্ছতা থাকবে।

আমরা সবাই সব জানি কিন্তু হাতে রয়েছে পেনসিল।

ধাপ তিন। এরই ভেতর কাগজ খুলে একদিন হতবাক হয়ে দেখলেন ক রাজ্যের এক জেলায় একটি পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে। জ্যান্ত দগ্ধ হয়েছেন নারী শিশু সহ একটি গোটা পরিবার, তাঁদের পোষ্য হাঁসেরাও বাদ যায়নি। তারপরে রাজ্যজোড়া হাহুতাশ ও অগ্নিগর্ভ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে সংবাদপত্রগুলি তুলে আনতে লাগল একটি বিশেষ খবর, যার সঙ্গে যুক্ত সেই জেলা ও সংলগ্ন অঞ্চলের বালিখাদানগুলি। এও বলা হয়, যে এই অগ্নিকান্ড আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। যে পোড়াল আর যার বাড়ি পুড়ল, সেই গ বাবু আর ঘ বাবু-এর লড়াই একটি সিমটম বা রোগ লক্ষণ মাত্র। আসল রোগ অনেকটাই গভীরে, আর তার সূত্র ওই অঞ্চলের বালিখাদানগুলি থেকে নেওয়া তোলা বা বেআইনি টোল ট্যাক্স।

ঘরের কাছের ধাপ তিনকে এতক্ষণে একটু চেনা ঠেকছে কি? সংবাদপত্রের প্রতি পাঠকের তো এগুলো ঠোঁটস্থ। ধাপ দুই ছিল শুষ্ক সরকারি দপ্তরের বাধ্যবাধকতার গল্প। ধাপ একের সঙ্গে সংযোগটা এতক্ষণে খানিকটা হলেও বোঝা গেল বোধ হয়। তিন ধাপ একই সুতোয় বাঁধা। আগুন লাগা ঘরটি আসলে একটা প্রতীক। আসলে তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো খাদান সংক্রান্ত বেলাগাম বেআইনি কারবার, মাফিয়া রাজ আর রাষ্ট্রের নাকের তলা দিয়ে অবাধে দুর্নীতি চালিয়ে যাবার চিত্র এভাবেই প্রতিফলিত হয়। বোর্নিওর জঙ্গল থেকে ফিলিপিনস... ভারতের ক রাজ্য অব্দি বিস্তৃত একই গল্প। সরকারি ঔদাসীন্য, চোখ বুজে থাকা, আর অপরাধীদের অবাধে নিজেদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দেওয়া... এই মিলিয়ে এ গল্পটাও কৃষণ চন্দরের জামুন কা পেড়ের চেয়ে কিছু কম না।

Vol. 70 Issue No. 16 শনিবার ১১ জুন, ১৮ জুন ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com
গণবার্তা

নূপুর শর্মার বিধ্বংসী মন্তব্যের প্রতিবাদে অবরোধ

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা :

বিজেপি মুখপাত্র নূপুর শর্মা প্রকাশ্যে ন্যাশনাল টেলিভশনে মোহাম্মদকে পিডোফাইল বলেছেন। নাভিকা কুমার নামক এক হিন্দুত্ববাদী এঙ্করের শো-তে। পুরো ব্যাপারটাই স্ক্রিপ্টেড, কারণ নবীর অপমানে ক্রুদ্ধ সংখ্যালঘু জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করছে—এটাই তো সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আদর্শ রেসিপি। জাতীয় সংবাদমাধ্যম জুড়ে বাংলার রাজপথের ছবি, আর প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সেই ছবি দিনভর দেখলেন দেশের মানুষ এবং তাঁদের ধারণা হলো যে তৃণমূলের সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের রাজত্ব চলছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। একই সঙ্গে রাজ্যের খেটে খাওয়া স্বল্পশিক্ষিত মুসলিম সমাজের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মসীহা বলে প্রতিষ্ঠা করাও গেলো।

এই সেই তৃণমূল প্রশাসন যারা চাকরির দাবিতে বামপন্থীদের মিছিলে লাঠি চালিয়ে মইদুল মিদ্যাকে খুন করেছিল, এই সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ, আনিস খানকে ঘরে ঢুকে খতম করতে যাদের এতোটুকুও হাত কাঁপেনি। শহীদ সুদীপ্ত গুপ্ত থেকে সুজেট জর্ডন বা সাম্প্রতিককালে হাঁসখালিতে ধর্ষিতা মেয়েটি অথবা কামদুনির মুখগুলো—কেউ নিস্তার পায়নি এই নির্লজ্জ সরকারের জিঘাংসার হাত থেকে। এমনকি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ডাকা মিছিলে পুলিশ নির্দয়ভাবে লাঠি চালিয়েছে। শ্রমিকের ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে বন্ধ ডাকার অধিকার পর্যন্ত আজ নিষিদ্ধ। হীরক রানীর রাজ্য। যিনি নিজে বিরোধী থাকাকালীন টানা সাতাশ দিন রাজপথ অবরুদ্ধ করে অনশনের নাটক করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো হাওড়ায় টানা বারো ঘণ্টা ধরে তান্ডব চালালো কারা? কার নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন চুপ করে বসে এই গুন্ডামি চালাতে দিল উন্মত্ত জনতাকে? প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা। এই যাবতীয় জঙ্গি আন্দোলনের পিছনে খাটছে আর এস এসের পুঁজি। প্রথমে তাদের মুখপাত্রকে দিয়ে চূড়ান্ত নোংরাভাষায় ইসলাম ধর্ম ও তার নবীকে অপমান করানো হলো। তারপর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, যেমন কাতার, কুয়েত, ইরান, জর্ডান, বাহরিন মোদী সরকারকে তুলোধনা করায় এবং ভারতীয় পণ্য বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে চাপে পড়ে ঘটনার সাতদিন পর তাঁকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হলো।

অথচ তাঁর বিরুদ্ধে ব্লাসফেমাস মন্তব্য করা, দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার মতো অপরাধেরজন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে কোনো মামলা করলো না কেন্দ্রীয় সরাকর। ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রায় সাতদিন পরে হঠাৎই হাওড়া জেলার জাতীয় সড়ক জুড়ে প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব চালালেন একদল ব্যক্তি। তাঁদের চেহারা, পোশাক আশাক মনে করিয়ে দেয় নাগরিক আইন বিরোধী আন্দোলনকারী জনগণ সম্পর্কে নরেন্দ্র মোদীর সেই স্মরণীয় উক্তি—''ইন লোগো কো তো হম কপড়ো সে পহচন লেতে হ্যায়।'' আসলে গত দু'দিনের নৈরাজ্যের ফলে আরএসএসের দুই শাখা—তৃণমূল এবং বিজেপির জন্য উইন-উইন সিচ্যুয়েশন তৈরি হয়েছে। একদিকে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখার মরীয়া প্রচেষ্টা চললো রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, অন্যদিকে গোদী মিডিয়া পেয়ে গেলো ''হিন্দু খতরে মে হ্যায়'' ন্যারোটিভের স্বপক্ষে অব্যর্থ কিছু দৃশ্য।

সারা দেশজুড়ে প্রচারিত এই ভাষা বিভাজনের রাজনীতিকেই পুষ্ট করলো। পিছনে ঠেলে দিলো ভাত-কপড়-কর্মসংস্থান-বাকস্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে আমরা জানতে পারছি যে এই গণবিক্ষোভ আদৌ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুসলিম ভোটকে এককাট্টা করার লক্ষ্যে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সাঙ্গোপাঙ্গোরা এই উন্মত্ততার পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি। আনিস হত্যা, বগটুই গণহত্যা, স্কুল সার্ভিস কমিশনে চাকরি কেলেঙ্কারি—এরকম বহুবিধ সমালোচনায় বিদ্ধ মমতা সরকারকে পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে অক্সিজেন দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই অলীক কুনাট্যের অবতারণা। তাই আরএসএসের মুখপত্রে মমতাকে দুর্গা আখ্যা দেওয়া হয়, পরিবর্তে সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত রাজ্য সফরে এলে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ফুল-মিষ্টির ভেট যায় ''সৌজন্য রক্ষার্থে''।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে দিল্লী সহ ভারতের নানান জায়গায় মুসলিমরা বিজেপি'র মুখপাত্রদের বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ করছেন। দুঃখের বিষয়, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি এই বিতর্কে ''সেফ খেলছে''। তাদের এই রক্ষণাত্মক স্ট্যাটেজির ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করছেন যে তাঁদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, এমনকি ব্যক্তি নিরাপত্তার দায়িত্বও তাঁদের নিজেদের কাঁধেই ন্যস্ত। রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই ব্যবহার করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এই সুযোগে আর এস এসের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী আসাদুদ্দিন ওয়েইসির মতো বিজেপির এজেন্টরা বিভাজনের রাজনীতির নোংরা খেলায় মেতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জোর গলায় মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। দেশের মানুষের যন্ত্রণার কথা শুনতে নয়, কেবলই নিজের ''মন কি বাত'' বলতে আগ্রহী আত্মমগ্ন রাষ্ট্রপ্রধান কার্যত একদলীয় আধিপত্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের টুঁটি টিপে ধরেছেন। ফ্যাসিবাদের বিভিন্ন চিহ্ন তাঁর দলের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোতে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

গোলওয়ালকরের স্বপ্নের হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের যে এজেন্ডা তার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলো একটার পর একটা তারা কার্যত বিনা বাধায় অতিক্রম করে চলেছে। বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কাজকর্মে সরকার সরাসরি নাক গলাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইউজিসি থেকে শুরু করে ইডি, সিবিআই, এনআইএ'র মতো প্রতিষ্ঠান তাদের অঙ্গুলিহেলনে চলছে। এমনকি বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা পর্যন্ত প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ৩৭০ ধারা অবলোপ থেকে শুরু করে বাবরি মসজিদ মামলার রায় এবং সর্বোপরি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ২০১৯-একটার পর একটা ক্ষেত্রে সাংবিধানিক মূল্যবোধকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। অতিমারির সুযোগ নিয়ে সংসদকে পাশ কাটিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের বহু লড়াই করে অর্জিত অধিকারগুলোকে একটা একটা করে লঘু করা হয়েছে। কৃষি আইন, শ্রম আইন, নয়া শিক্ষানীতি, পরিবেশ বিষয়ক আইন বা অরণ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে সরকার ঘনিষ্ঠ কর্পোরেটদের মুনাফা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে।

সম্প্রতি কাশীর জ্ঞানব্যাপী মসজিদে শিবলিঙ্গ আবিষ্কারের অপচেষ্টা মনে করিয়ে দিলো বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে হাড় হিম করা সেই স্লোগান—''ইয়ে তো পেহলি ঝাঁকি হ্যায়, কাশী মথুরা বাকি হ্যায়''। সেদিন লালুপ্রসাদ বা জ্যোতি বসুর মতো মুখ্যমন্ত্রীরা বুক চিতিয়ে বলতে পেরেছিলেন— ''সরকার না চাহি তো দাঙ্গা না হোই''। আর আজকের মমতা-নীতীশ -কেজরিরা দাঙ্গার উপক্রম দেখে লোভে ঠোঁট চাটছেন—কিভাবে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সুফল ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত করা যায়, এটাই তাঁদের একমাত্র চিন্তা।

এই পরিস্থিতিতে সংসদীয় দলগুলোর ওপরে ভরসা রাখা মুর্খামির নামান্তর। সময় এসেছে নাগরিক সমাজের একজোট হয়ে পথে নামার। হিন্দু হোক বা মুসলমান, বামপন্থী হোক বা ধর্মনিরপেক্ষ মধ্যপন্থী আজকের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সঠিক অবস্থান নিতে হবে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা—সেই কর্তব্যে অবিচল থাকতে আমরা প্রস্তুত তো?

দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার আন্তর্জাতিক তথা জাতীয় রাজনীতিতে তাৎপর্য অপরিসীম। অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশনের ৫৭টি দেশের চাপে নূপুর-নবীনরা যে রাতারাতি ফ্রিজ এলিমেন্ট হয়ে যায় এবং ভেঙ্কাইয়া নাইডুকে দোহায় গিয়ে মোদির ইনক্লুসিভ ভাবমূর্তি ফেরির চেষ্টায় নামতে হয়। এটার প্রায়োগিক দিক কী? দিকটা হচ্ছে এই যে, হিন্দুত্ববাদীদের শুধু হিন্দুত্ববাদ-বিরোধী কাউন্টার ন্যারোটেভ দিয়ে জব্দ করা যাবে না, ওদের জব্দ করতে হবে জনজীবন-বিধ্বংসী প্রতিটি অর্থনৈতিক পলিসিতে পথে নেমে বুনিয়াদি জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে। জনগণের স্তরে এই ঐক্য গড়ার কর্মসূচি তাই বর্তমান সময়ের দাবি।

রাজ্য সরকার রেশনের অধিকার থেকে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করতে চলেছে

রেশন থেকে যতদূর সম্ভব হাত গোটাচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সরকার। যেসব কার্ড নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছে রাজ্য সরকার পরিচালিত যোজনা থেকে তা ক্রমশ বাদ পড়বে। প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ মানুষের কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেটেড রেখেছে সরকার। ফলে আর কে এস ওয়াই থেকে অনেকেই বাদ পড়বে। এভাবেই রাজ্যের খরচ কমানোর পথ খুঁজে নিচ্ছে সরকার। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় এরাজ্যে ৬ কোটি ১ লক্ষের বেশি মানুষ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। শুরু থেকে এটাই চলছিল। তৃণমূল সরকার চালু করল খাদ্য সুরক্ষা যোজনা এক এবং দুই। সুরক্ষা যোজনা এক ছিল জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার সমতুল্য। দু'টাকা কেজি দরে চাল পাওয়া যায় এই যোজনাতে। রাজ্য সরকার যাদের ডিঅ্যাক্টিভেটেড করে রেখেছে তাদের অধিকাংশই কার্ড সক্রিয় করতে আসছে না বা করা যাচ্ছে না। খাদ্যমন্ত্রীর রথীন ঘোষের বাহানা অনেকেরই ডুপ্লিকেট কার্ড ছিল, আবার অনেকে মারা গেছেন। এমন নাকি ১৪ লক্ষ ডুপ্লিকেট আর ৫৪ লক্ষ মৃত মানুষের কার্ড ছিল। এভাবেই ৬৮ লক্ষ মানুষের ডিঅ্যাক্টিভেটেড কার্ডের ব্যাখ্যা দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

কিন্তু রেশন কার্ডের অধিকার নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার। কেউ যদি এখন না নেন ভবিষ্যতে তো তিনি নিতে পারেন। সুতরাং নিষ্ক্রিয় রাখার কি অর্থ আছে? আরেকটি প্রযুক্তিগত সমস্যার বাহানার দিচ্ছে সরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়াতে রাজ্য সরকার যথেষ্ট ঢিলেমি দেখিয়েছে। তাছাড়া আঙুলের ছাপ না মেলা, ওটিপি না আসা ইত্যাদি সমস্যার জন্য অনেক কার্ডই সরকার ব্লক করে দিচ্ছে।

এভাবে ধীরে সুস্থে যথেষ্ট কৌশলে বহু কার্ডকে নিষ্ক্রিয় করে নাগরিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত শুধু তারা কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা অনুযায়ী রেশন সামগ্রীর পূর্ণ ব্যবহার করবে। যা বাদ যাবে তা রাজ্যের যোজনা থেকে। এভাবেই রেশনের দায়িত্ব ধীরে ধীরে যথাসম্ভব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-